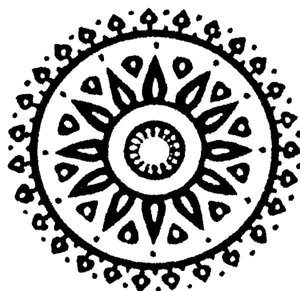
বুদ্ধদেব বসুর
শ্রেষ্ঠ কবিতা

বুদ্ধদেব বসুর

শ্রেষ্ঠ কবিতা



নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

প্রচ্ছদচিত্র শ্রীইন্দ্র দুগার কর্তৃক অঙ্কিত

প্রথম মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৩৫৯
ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩

দাম : পাঁচ টাকা

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

কোনো এক স্বাক্ষরশিকারী রবীন্দ্রনাথকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলো: 'আপনার মতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বই কোনটি?' উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'Nature abhors Superlatives.'—অতি সত্য এই কথা। চরমের নির্দিষ্ট নমুনা পাওয়া যায় শুধু জড় প্রকৃতিতে, পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, সবচেয়ে গভীর সমুদ্র—এগুলোর অস্তিত্ব নিঃসন্দেহেই আছে, কিন্তু মানুষের চিন্ময় প্রকৃতি যেখানে সক্রিয়, সেখানে ভালো-মন্দের তারতম্য থাকলেও চরম ব'লে কিছু নেই, শ্রেষ্ঠ ব'লে কিছু নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখক কে, শ্রেষ্ঠ বই কোনটি, এ-সব বালোচিত প্রশ্নের যেমন কোনো উত্তর হয় না, তেমনি কোনো একজন লেখকের শ্রেষ্ঠ বই কোনটি, বা শ্রেষ্ঠ কবিতা কোন কোনটি, এ বিষয়েও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজে কিছু কবুল করতে রাজি হবেন না। 'শ্রেষ্ঠ' কথাটা সমালোচনায় ব্যবহৃত হয় শুধু একটা সুবিধাজনক ব্যবস্থারূপে, কিংবা তার প্রয়োগের ক্ষেত্র সমালোচক এমনভাবে সীমাবদ্ধ ক'রে দেন যাতে কথাটার আক্ষরিক অর্থ—কিংবা অর্থহীনতার বদলে একটি স্পর্শসহ তাৎপর্য পাওয়া যায়। Nature-এর চেয়েও অনেক বেশি, Art abhors superlatives।

আমিও পাঠকদের অনুরোধ জানাই, এই গ্রন্থের নামকরণে 'শ্রেষ্ঠ' কথাটা তাঁরা যেন আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করেন। ওটা একটা চলতি কথা, ব্যবহারযোগ্য নাম মাত্র, এ-কবিতা কেন আছে, ও-কবিতা কেন নেই, এই তর্ক অনিবার্য হ'লেও শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল, আসল কথাটা এই যে এই গ্রন্থের ভিতর দিয়ে কবিকে ঠিক চেনা যাচ্ছে কিনা। অন্তত আমি সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি, 'বন্দীর বন্দনা'য় সতেরো বছর বয়সে প্রথম যখন আমি নিজেকে আবিষ্কার করেছিলুম, সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত যে সব কবিতায় আমার 'আমি' সত্য হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে, তা-ই থেকে সংকলন ক'রে এই গ্রন্থটি সাজিয়েছি। বিন্যাসে কালানুক্রমিক ব্যবস্থা রেখেছি, যাতে পরিণতির ধারাটা বোঝা যায়, তাছাড়া ভাবগত ও প্রকরণগত বৈচিত্র্যেরও উদাহরণ দিয়েছি—গ্রন্থের আয়তনের মধ্যে যতটা সম্ভব। সেইজন্য আমার ছোটোদের কবিতাও এর অন্তর্গত হয়েছে, এবং কিছু অনুবাদও—কবিতার অনুবাদে যে-সব সমস্যা দেখা দেয়, তার সমাধানে কবিদের একটি বিশেষ রকমের পরীক্ষা হয় ব'লে আমার বিশ্বাস। পরিশেষে পাঠকের কাছে নিবেদন এই যে এই সংকলনটিকে তাঁরা যেন সংগ্রহ ব'লে

ভুল না করেন; কোনো কবিকে সম্পূর্ণ ক'রে জানতে হ'লে তাঁর সমগ্র রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় প্রয়োজন, এই কথাটি ভুলে গেলে আমার প্রতি অবিচার করা হবে।

কলকাতা
২২-১১-১৯৫২

বু. ব.

অনুবাদ

ছোটোদের কবিতা

* চিহ্নিত কবিতাগুলি, অনুবাদ ও ছোটোদের কবিতা ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

শাপভ্রষ্ট

যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে
ব'সে আছি আমি।
দগ্ধ স্বর্ণরেণুসম বালুকণারাশি
লুটায় চরণপ্রান্তে অকৃপণ বিপুল বৈভবে।
ঊর্ধ্বে মম রক্তিম আকাশ—
প্রভাতসূর্যের লজ্জা রঞ্জিত করিছে অরণ্যানী।
সদ্য-নিদ্রা-জাগরিত গগনের পাণ্ডুভাল-'পরে
বহ্নিশিখা করিছে অর্পণ :
কামনার বহ্নি সে যে, স্বপনের সলজ্জ বিকাশ।
গোলাপের বর্ণে-বর্ণে স্বপ্নসুধা মাখা,
আরক্তিম কামনায় আঁকা।
আমার অন্তর নিয়ে একাকী বসিয়া আছি আমি
উচ্ছ্বসিত যৌবনের সিন্ধুতীরে।

সম্মুখে গরজে সিন্ধু বেদনার দুঃসহ পীড়নে।
লক্ষ-লক্ষ লুব্ধ ওষ্ঠ মেলি'
চুম্বিয়া মুছিতে চাহে গগনের তরুণ রক্তিমা,
রিক্ত করি' দিতে চাহে ধরিত্রীর তীর্থযাত্রীদলে
সহসা-বন্যায়।
নিষ্ফল আক্রোশে তার ক্রূর জিহ্বা উদ্গারিছে বিষ,
তরঙ্গমথিত ফেনা রেখে যায় সৈকতশিয়রে।
গাঢ়কৃষ্ণ জলরাশি অস্বচ্ছ অতল
নিত্য-নব অমঙ্গলে করে জন্মদান
গোপন গভীর গর্ভে ;
অকল্যাণ বায়ু বহি' প্রাণের মন্দিরে
নির্বাপিত করি' দেয় পূজার প্রদীপ ,
ম্লানমুখে ঝরি' পড়ে কাননে অস্ফুট শেফালিকা
হিমস্পর্শে তার।

আমি শুষ্ক, নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন,
আমি হিংস্র, দুরন্ত, পাশব।
সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
হেরি' মোর রুদ্ধ দ্বার, অন্ধকার মন্দির-প্রাঙ্গণ।
সুদূর কুসুমগন্ধে তার যাত্রাবাঁশি বেজে ওঠে;
দৈন্যভরা গৃহ মোর শূন্যতায় করে হাহাকার।
—যৌবন আমার অভিশাপ।

ক্ষণে-ক্ষণে তরঙ্গের 'পরে
গগনের স্নিগ্ধ শান্ত আলোখানি বিচ্ছুরিত হ'য়ে যেন লাগে;
ফুটে ওঠে সোনার কমল
ক্ষণিক সৌরভে তার নিখিলেরে করিয়া বিহ্বল।
সেই পদ্মগন্ধখানি এনে দেয় মোর পরিচয়
পল্লব-সম্পুটে।
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়ি আমি লিখন তাহার:
'হে তরুণ, দস্যু নহো, পশু নহো, নহো তুচ্ছ কীট—
শাপভ্রষ্ট দেব তুমি।'

শাপভ্রষ্ট দেব আমি!
আমার নয়ন তাই বন্দী যুগ-বিহঙ্গের মতো
দেহের বন্ধন ছিঁড়ি' শূন্যতায় উড়ি' যেতে চায়
আকণ্ঠ করিতে পান আকাশের উদার নীলিমা।
তাই মোর দুই কর্ণে অরণ্যের পল্লব-মর্মর
প্রেমগুঞ্জনের মতো কী-অমৃত ঢালে মর্ম-মাঝে।
রবির গভীর স্নেহে, শিশিরের শীতল প্রণয়ে
শুষ্ক শাখে তাই ফোটে ফুল,
দক্ষিণ পবন তারে মৃদু হাস্যে আন্দোলিয়া যায়।
রাত্রির রাজ্ঞীর বেশে পূর্ণচন্দ্র কভু দেয় দেখা,

আঁধারের অশ্রুকণা তারার মণিকা হ'য়ে জ্বলে
ত্রিযামার জাগরণতলে।
স্তব্ধ চিত্তে চেয়ে থাকি; অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনা
সযত্নে সাজাই নিত্য উৎসবের প্রদীপের মতো
আনন্দের মন্দির-সোপানে।
সুধায় নির্মিত মোর দেহসৌধখানি,
ইন্দ্রিয় তাহার বাতায়ন—
মুক্ত করি' রাখি' তারে আকাশের অকূল আলোকে
অন্ধকার-অন্তরালে অন্তরের মাঝে
বিনিঃশেষে করি যে গ্রহণ!

অক্ষম, দুর্বল আমি নিঃসম্বল নীলাম্বর-তলে,
ভঙ্গুর হৃদয়ে মম বিজড়িত সহস্র পঙ্গুতা—
জীবনের দীর্ঘ পথে যাত্রা করেছিনু কোন স্বর্ণরেখাদীপ্ত উষাকালে—
আজ তার নাহিকো আভাস।
আজ আমি ক্লান্ত হ'য়ে পথপ্রান্তে প'ড়ে আছি নীরব ব্যথায় শান্ত মুখে
ঝ'রে-পড়া বকুলের গন্ধস্নিগ্ধ বিজন বিপিনে।
সেই মোর গোধূলির সুরভি আঁধারে
যার সাথে দেখা,
যার সাথে সংগোপনে প্রণয়গুঞ্জন,
যার স্পর্শে ক্ষণে-ক্ষণে হৃদয়ের বেদনার মেঘে
চমকিয়া খেলি' যায় হর্ষের বিজলী;—
নেত্রের মুকুরে তার দেখেছি আপন প্রতিচ্ছবি,
দেখিয়াছি দিনে-দিনে, ক্ষণে-ক্ষণে আপনার ছায়া,
দেখিয়াছি কান্তি মম দেবতার মতো অপরূপ,
ভাস্করের মতো জ্যোতির্ময়;—
তখন বুঝেছি প্রাণে, আমি চিরন্তন পুণ্যচ্ছবি,
নিষ্কলঙ্ক রবি।
তখন বিষণ্ণ বায়ু নিশ্বসি' কহিয়া গেছে কানে:
'শাপভ্রষ্ট দেব তুমি!'

নিকুঞ্জের সঙ্গী মোর হাসিয়া কয়েছে যবে কথা
তুচ্ছতম বাণী তার রূপান্তর করেছে গ্রহণ,
বিহঙ্গের উদাসীন কলকণ্ঠ-সাথে মিশি' আসি'
বেজেছে আমার বক্ষে দুরাশার মতো—
'শাপভ্রষ্ট দেব তুমি !'

তাই আজ ভাবি মনে-মনে—
পঙ্কের কলঙ্ক-বারি উত্তরিয়া আছে মোর স্থান
পঙ্কজের শুভ্র অঙ্কে।
শেফালি-সৌরভ আমি, রাত্রির নিশ্বাস,
ভোরের ভৈরবী।
সংসারের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কণ্টকের তুচ্ছ উৎপীড়ন
হাস্যমুখে উপেক্ষিয়া চলি।
যেথা যত বিপুল বেদনা,
যেথা যত আনন্দের মহান মহিমা—
আমার হৃদয়ে তার নব-নব হয়েছে প্রকাশ।
বকুলবীথির ছায়ে গোধূলির অস্পষ্ট মায়ায়
অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত।—
শাপভ্রষ্ট দেবশিশু আমি !

বন্দীর বন্দনা

প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি' রচেছো আমায়—
নির্মম নির্মাতা মম !   এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার !
মনে করি, মুক্ত হবো , মনে ভাবি, রহিতে দিবো না
মোর তরে এ-নিখিলে বন্ধনের চিহ্নমাত্র আর।
রুক্ষ দস্যুবেশে তাই হাস্যমুখে ভেসে যাই উচ্ছ্বসিত স্বেচ্ছাচার-স্রোতে,
উপেক্ষিয়া চ'লে যাই সংসার-সমাজ-গড়া লক্ষ-লক্ষ ক্ষুদ্র কণ্টকের
নিষ্ঠুর আঘাত , দাসত্বের স্নেহের সন্তান

সংস্কারের বুকে হানি তীব্র তীক্ষ্ণ রূঢ় পরিহাস,
অবজ্ঞার কঠোর ভর্ৎসনা।
মনে ভাবি, মুক্তি বুঝি কাছে এলো—
বিশ্বের আকাশে বহে লাবণ্যের মৃত্যুহীন স্রোত।

তারপরে একদিন অকস্মাৎ বিস্ময়ে নেহারি—
কোথা মুক্তি?
সহস্র অদৃশ্য বাধা নিশিদিন ঘিরে আছে মোরে,
যতই এড়ায়ে চলি, ততই জড়ায়ে ধরে পায়ে,
রোধ করে জীবনের গতি।
সে-বন্ধন চলে মোর সাথে-সাথে জীবনের নিত্য অভিসারে
সুন্দরের মন্দিরের পানে।
সে-বন্ধন মগ্ন করি' রেখেছে আমারে
আকণ্ঠ পঙ্কের মাঝে।
সে-বন্ধন লক্ষ-লক্ষ লাঞ্ছনার বীজাণুতে
কলুষিত করিয়াছে নিশ্বাসের বাতাস আমার—
লোহিত শোণিত মম নীল হ'য়ে গেছে সে-বন্ধনে।
ক্ষণ-তরে নাহি মুক্তি; কর্ম-মাঝে, মর্ম-মাঝে মোর,
প্রতি স্বপ্নে, প্রতি জাগরণে,
প্রতি দিবসের লক্ষ বাসনা-আশায়
আমারে রেখেছো বেঁধে অভিশপ্ত, তপ্ত নাগপাশে
সৃজন-উষার আদি হ'তে—
উদাসীন স্রষ্টা মোর!
মুক্তি শুধু মরীচিকা—সুমধুর মিথ্যার স্বপন,
আপনার কাছে মোরে করিয়াছো বন্দী চিরন্তন।

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার-কামনা
রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি;—

তাদের মেটাতে হয় আত্ম-বঞ্চনার নিত্য ক্ষোভ।
আছে ক্রূর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় স্বার্থপর লোভ,
হিরণ্ময় প্রেমপাত্রে হীন হিংসা-সর্প গুপ্ত আছে।
আনন্দনন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন,
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রীতা।
সুন্দরের ধ্যান মোর এরা সব ক্ষণে-ক্ষণে ভেঙে দিয়ে যায়,
কাঁদায় আমারে সদা অপমানে ব্যথায়, লজ্জায়।
ভুলিয়া থাকিতে চাই,— ক্ষণ-তরে ভুলে যাই ডুবে গিয়ে লাবণ্য-উচ্ছ্বাসে—
তবু, হায়, পারিনে ভুলিতে।
নিমেষে-নিমেষে ত্রুটি, পদে-পদে স্খলন-পতন,
আপনারে ভুলে যাওয়া—সুন্দরের নিত্য অসম্মান।
বিশ্বস্রষ্টা, তুমি মোরে গড়েছো অক্ষম করি' যদি,
মোরে ক্ষমা করি' তব অপরাধ করিয়ো ক্ষালন।

জ্যোতির্ময়, আজি মম জ্যোতির্হীন বন্দীশালা হ'তে
বন্দনা-সংগীত গাহি তব।
স্বর্গলোভ নাহি মোর, নাহি মোর পুণ্যের সঞ্চয়,
লাঞ্ছিত বাসনা দিয়া অর্ঘ্য তব রচি আমি আজি :
শাশ্বত সংগ্রামে মোর আহত বক্ষের যত রক্তাক্ত ক্ষতের বীভৎসতা,
হে চিরসুন্দর, মোর নমস্কার-সহ লহো আজি।

বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।
না-হয় ডুবিয়া আছি কৃমিঘন পঙ্কের সাগরে,
গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষ্ণায়
শুষ্ক হ'য়ে আছে তবু।
না-হয় রেখেছো বেঁধে, তবু জেনো, শৃঙ্খলিত ক্ষুদ্র হস্ত মোর
উধাও আগ্রহভরে ঊর্ধ্বনভে উঠিবারে চায়
অসীমের নীলিমারে জড়াইতে ব্যগ্র আলিঙ্গনে।
মোর আঁখি রহে জাগি' নিস্তব্ধ নিশীথে,

আপন আসন পাতে নিদ্রাহীন নক্ষত্রসভায়,
স্বচ্ছ শুভ্র ছায়াপথে মায়ারথে ভ্রমি' ফেরে কভু
আবেশ-বিভ্রমে।
তুমি মোরে দিয়েছো কামনা, অন্ধকার অমা-রাত্রি-সম,
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্নসুধা মম।
তাই মোর দেহ যবে ভিক্ষুকের মতো ঘুরে মরে
ক্ষুধাজীর্ণ, বিশীর্ণ কঙ্কাল—
সমস্ত অন্তর মম সে-মুহূর্তে গেয়ে ওঠে গান
অনন্তের চির-বার্তা নিয়া ;
সে কেবল বার-বার অসীমের কানে-কানে একটি গোপন বাণী কহে—
'তবু আমি ভালোবাসি, তবু আমি ভালোবাসি আজি !'
রক্তমাঝে মত্তফেনা, সেথা মীনকেতনের উড়িছে কেতন,
শিরায়-শিরায় শত সরীসৃপ তোলে শিহরণ,
লোলুপ লালসা করে অন্যমনে রসনালেহন।
তবু আমি অমৃতাভিলাষী !—
অমৃতের অন্বেষণে ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি,
ভালোবাসি—আর-কিছু নয়।
তুমি যারে সৃজিয়াছো, ওগো শিল্পী, সে তো নহি আমি,
সে তোমার দুঃস্বপ্ন দারুণ।
বিশ্বের মাধুর্য-রস তিলে-তিলে করিয়া চয়ন
আমারে রচেছি আমি, —তুমি কোথা ছিলে অচেতন
সে-মহাসৃজন-কালে—তুমি শুধু জানো সেই কথা।

মোর আপনারে আমি নবজন্ম করিয়াছি দান।
নিখিলের স্রষ্টা তুমি, তোমার উদ্দেশে আজি তাই,
মোর এই সৃষ্টিকার্য উৎসৃষ্ট করিনু সন্তর্পণে।
মোর এই নব সৃষ্টি—এ যে মূর্ত বন্দনা তোমার,
অনাদির মিলিত সংগীত।
আমি কবি, এ-সংগীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাসে,
এই গর্ব মোর—

তোমার ত্রুটিরে আমি আপন সাধনা দিয়া করেছি শোধন,
এই গর্ব মোর।
লাঞ্ছিত এ-বন্দী তাই বন্ধহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
বন্দনার ছদ্মনামে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ গেলো হানি'
তোমার সকাশে।

প্রেমিক

নতুন ননীর মতো তনু তব ? জানি, তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে কুৎসিত কঙ্কাল—
(ওগো কঙ্কাবতী)
মৃত-পীত বর্ণ তার : খড়ির মতন শাদা শুষ্ক অস্থিশ্রেণী—
জানি; সে কিসের মূর্তি। নিঃশব্দ, বীভৎস এক রুক্ষ অট্টহাসি—
নিদারুণ দন্তহীন বিভীষিকা।
নতুন ননীর মতো তনু তব ? জানি, তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে সেই
কঠিন কাঠামো ;
হরিণ-শিশুর মতো করুণ আঁখির অন্তরালে
ব্যাধিগ্রস্ত উন্মাদের দুঃস্বপ্ন যেমন।

তবু ভালোবাসি।
নতুন ননীর মতো তব তনুখানি
স্পর্শিতে অগাধ সাধ, সাহস না পাই।
সিন্ধুগর্ভে ফোটে যত আশ্চর্য কুসুম
তার মতো তব মুখ, তার পানে তাকাবার ছল
খুঁজে নাহি পাই।
মনে করি কথা কবো : আকুলিবিকুলি করে কত কথা রক্তের ঘূর্ণিতে
(ওগো কঙ্কাবতী !)
বারেক তাকাই যদি তব মুখপানে,

পৃথিবী টলিয়া ওঠে, কথাগুলি কোথায় হারায়,
খুঁজে নাহি পাই।
দূর থেকে দেখে তাই ফিরে যাই ; (যদি কাছে আসি,
তব রূপ অটুট র'বে কি ?)
ফিরে চ'লে যাই।
দূর থেকে ভালোবাসি দেহখানি তব—
রাতের ধূসর মাঠে নিরিবিলি বটের পাতারা
টিপটাপ শিশিরের ঝরাটুকু
যেমন নীরবে ভালোবাসে।

মোরে প্রেম দিতে চাও ? প্রেমে মোর ভুলাইবে মন
তুমি নারী, কঙ্কাবতী, প্রেম কোথা পাবে ?
আমারে কোরো না দান, তোমার নিজের যাহা নয়।
ধার-করা বিত্তে মোর লোভ নাই , সে-ঋণের বোঝা
বাড়িয়া চলিবে প্রতিদিন—
যতক্ষণ সেই ভার সর্বনাশ না করে তোমার।
সে-ঋণ করিতে শোধ দ্রৌপদীর সবগুলি শাড়ি
খুলিয়া ফেলিতে হবে।
সভামধ্যে, মোর দৃষ্টি-'পরে
নিতান্ত নিরাবরণা, দরিদ্র, সহজ
তোমাকে দাঁড়াতে হবে , রহিবে না আর
রহস্যের অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রজাল।

বরং প্রেমের ভাণ করিয়ো না—সেই হবে ভালো :
দূর থেকে দেখে মুগ্ধ হবো
তবু মুগ্ধ হবো।
না-ই বা চিনিলে মোরে। আমি যদি ভালোবেসে থাকি,
আমিই বেসেছি।

সে-কথা তোমার কানে নানা সুরে জপিতে চাহি না ;—
আমার সে-ভালোবাসা—তুমি তারে পারিবে না কখনো বুঝিতে।

তবু ধরা যাক।
ধরা যাক, তুমি মোরে স্থাপিয়াছো হৃদয়ের মণির আসনে,
তুমি—আমি—দু-জনেরই সুদৃঢ় বিশ্বাস,
তুমি মোরে ভালোবাসো।
সেই অনুসারে মোরা চলি-ফিরি, কথা কই, হাতে হাত রাখি ;
লাল হ'য়ে ওঠো তুমি—অনেক লোকের মাঝে চোখে চোখ পড়ে যদি কভু,
লাল হ'য়ে উঠি আমি—পাশের লোকের মুখে তব নাম শুনি কভু যদি ;
আমার মুখের 'পরে চুলগুলি আকুলিয়া দাও—
সেই গন্ধে রোমাঞ্চিয়া ওঠে বসুন্ধরা।

আরো কহিবো কি ?
ননীর শরীর তব যেমন রেখেছে ঢেকে কুৎসিত কঙ্কাল,
তেমনি তোমার প্রেম কোন প্রেতে করিছে গোপন—
তাহা কহিবো কি ?
আমার দুর্ভাগ্য এই, সকলি জেনেছি।
মোর কাছে এসে আজ যে-অঞ্চল টানি' দাও সুন্দর লজ্জায়,
জানি, তাহা শ্লথ হবে কোনো-এক রাতে ,—
(তখন কোথায় আমি ?)
যে-শঙ্কার শিহরণ তব দেহ-লাবণ্যেরে মোব কাছে করেছে মধুব,
(ওগো কঙ্কাবতী—
মধুর ! মধুর !)
জানি, তাহা থেমে যাবে ধূসর প্রভাতে এক, যবে চক্ষু মেলি'
পার্শ্বস্থ জানুর দৃঢ় আকুঞ্চন থেকে
আপনার কটিতট নেবে মুক্ত করি'।

অনিশ্চিত ভয়ে ভরা ভবিষ্যৎ-তরে
যে-উৎকণ্ঠা নিত্য হানা দেয়
তোমারে-আমারে ;—
আমাদের মিলনের পরিপূর্ণতম মুহূর্তটি
যে-ব্যথায় টনটন ক'রে ওঠে ,—
তব কোলে মাথা রেখে চুলগুলি নিয়ে যবে আঙুলে জড়াই,
তখন যে-বেদনায় হেরি তোমা দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ,
যে-বেদনা এই প্রেমে করেছে মহান,
(ওগো কঙ্কাবতী—
মহান ! মহান !)
জানি, তুমি ভুলে যাবে সে-উৎকণ্ঠা, সে-বেদনা, সেই ভালোবাসা
প্রথম শিশুর জন্মদিনে।
তোমার যে-স্তনরেখা বঙ্কিম, মসৃণ, ক্ষীণ, সততস্পন্দিত —
দেখেছি অস্পষ্টতম আমি শুধু আভাস যাহার,
যাহার ঈষৎ স্পর্শ আনন্দে করেছে মোরে উন্মাদ—উন্মাদ,
জানি, তাহা স্ফীত হবে সদ্যোজাত অধরের শোষণ-তিয়াষে।
আমারে করিতে মুগ্ধ যে সুস্নিগ্ধ সুষমায় আপনারে সাজাতে সর্বদা,
তোমার যে-সৌন্দর্যেরে ভালোবাসি (তোমারে তো নয় !),
জানি, তা ফেলিয়া দেবে অঙ্গ হ'তে টেনে—
কারণ, তখন তব জীবনের ছাঁচ
চিরতরে গড়া হ'য়ে গেছে,
কিছুতেই হবে নাকো তার আর কোনো ব্যতিক্রম।
সুন্দর না-হ'লে যদি জীবনের পাত্র হ'তে কোনো ক্ষতি, ক্ষয় নাহি হয়,
সুন্দর হবার গূঢ়, দুরূহ সাধনা—
ক্লেশকর তপশ্চর্যা
কে আর করিতে যায় তবে ?

সব আমি জানি, তবু—তাই ভালোবাসি,
জানি ব'লে আরো বেশি ভালোবাসি।

জানি, শুধু ততদিন তুমি র'বে তুমি,
যতদিন র'বে মোর প্রিয়া।
সম্মুখে মৃত্যুর গুহা, তোমার মৃত্যুর ;
ফুটেছো ফুলের মতো ক্ষণতরে আজিকার উজ্জ্বল আলোতে,
প্রেমের আলোতে মোর—
তারি মাঝে যত তব ঝিকিমিকি, ফুরফুরে প্রজাপতিপনা !
তাই সেই শোভা পান করি—
আঁখি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, আত্মা দিয়ে, মৃত্যুর কল্পনা দিয়ে
সেই শোভা পান করি।
তোমার বাদামি চোখ—চকচকে, হালকা, চটুল
তাই ভালোবাসি।
তোমার লালচে চুল,—এলোমেলো, শুকনো, নরম
তাই ভালোবাসি।
সেই চুল, সেই চোখ, তাহারা আমার কাছে অরণ্য গভীর,
সেথা আমি পথ খুঁজে নাহি পাই,
নিজেরে হারায়ে ফেলি সেই চোখে, সেই চুলে—লালচে-বাদামি,
নিজেরে ভুলিয়া যাই, আমারে হারাই—
তাই ভালোবাসি।

আর আমি ভালোবাসি নতুন ননীর মতো তনুলতা তব,
(ওগো কঙ্কাবতী !)
আর আমি ভালোবাসি তোমার বাসনা মোরে ভালোবাসিবার,
(ওগো কঙ্কাবতী !)
ওগো কঙ্কাবতী !

বিবাহ

যাহারে স্মরণ করি' সিন্দুর দিতেছো শুভ্র ভালে,
হে সুন্দরী, সে কি তব হৃদয়ের সীমাপ্রান্ত-'পরে
নামে বর্ষণের মতো ? উচ্ছলিত লীলাভঙ্গি-ভরে
তরঙ্গ তুলিয়া যায় খরস্রোতে, তীব্র, দ্রুত তালে ?
তুমি কি দেখেছো তারে অন্তরের স্তব্ধ রাত্রিকালে
বিশ্বের রহস্য-তল উন্মীলিত প্রহরে-প্রহরে ?
চরম মিলন-লগ্নে নিবিড়-নিমগ্ন পরস্পরে—
কী দুর্লভ আবিষ্কার তবু যেন রয়েছে আড়ালে !

অথবা লভেছো তারে বিধানের অন্ধ মূঢ়তায়
বাসনা-উত্তাপহীন, নিশ্চেতন সংকীর্ণ সংগমে ?
অনায়াস যুগ্মযাত্রা চিন্তাহীন আরামে মসৃণ ?
অথবা কি পরস্পরে কামনার উন্মত্ত বিভ্রমে
মুহূর্তে নিঃশেষ করি', হারায়ে ফেলেছো, উদাসীন,
প্রাত্যহিক তুচ্ছতায়, তন্দ্রা-বিজড়িত জড়তায় ?

মোরা তার গান রচি

মোরা তার গান রচি—যে-জীবন প্রশস্ত, প্রচুর,
প্রবল তরঙ্গ-ভঙ্গে ছুটিয়াছে যুগে-যুগান্তরে,
মিশে আছে সোনা আর ধুলা যার সলিল-শীকরে,
যার স্রোতে ভেসে যায় পঙ্ক আর নক্ষত্র ভঙ্গুর।
অলস আবেশে মোরা জীবনেরে দেখিনি মধুর ,—
ললাটে ঝরিছে স্বেদ—তারি স্বাদ মোদের অধরে,
হৃদয়ে দুঃখের যজ্ঞ—তারি জ্বালা প্রত্যেক অক্ষরে,
মোদের আকাশ রুক্ষ, শ্যাম স্বপ্নে নহে সে মেদুর।

উন্মাদ, উদ্দামগতি ছুটে চলে জীবন-জাহ্নবী,
জীবন—রহস্যে ভরা, পৃথিবী সে ব্যথায় বিশাল।

আবর্তে হারায়ে যায় পুঞ্জীভূত কুৎসিত জঞ্জাল।
মোদের প্রাণের মাঝে সেই প্রাণ, সে-প্রেরণা লভি'
মোরা রচিতেছি গান ,—মোরা সেই জীবনের কবি।
আমাদের চিরসঙ্গী নৃত্য-ক্ষিপ্ত, রিক্ত মহাকাল।

অসূর্যম্পশ্যা

শ্যাম মেঘপুঞ্জ যথা ঢেকে রাখে আকাশের লজ্জাহীন নীলিম নগ্নতা,
বিদ্রোহী তৃণের দল অনাবৃতা ধরিত্রীর রুক্ষ বক্ষে পরায় বসন,
প্রেমের পবিত্র ব্যথা আচ্ছাদন করি' রাখে কুমারীর কাম-চঞ্চলতা ,—
তেমনি ঢাকিয়া রাখো তোমার রূপের স্বপ্নে আমার সমস্ত প্রাণমন।
দৃশ্যমান জগতের চিহ্ন যথা লুপ্ত হয় অমাবস্যা-আঁধার-জোয়ারে,
হে অসূর্যম্পশ্যা, তব রূপের বন্যার স্রোতে মৃত্যু মোর ঘটুক তেমনি,
নিঃশেষে নিমগ্ন হ'য়ে নিজেরে হারাই যেন আনন্দে নীরন্ধ্র অন্ধকারে,
ঝরুক তোমার প্রেম, আকাশের ফাঁকে-ফাঁকে তারা যথা ঝরায় রজনী।

তনুর ললিত ছন্দে রচিয়াছো তিলে-তিলে অপরূপ যে-কবিতাখানি,
আমার ধ্যানের মন্ত্রে নিয়ত ধ্বনিত হোক মৌন তার স্বরের ঝংকার ,
প্রাণের মৃন্ময় দীপে অগ্নির অক্ষর এঁকে লিখিয়াছো যে-অপূর্ব বাণী,
মর্মের অরণ্যে মোর মর্মরি' উঠুক তুলি' সংগীতের তরঙ্গ তাহার।
হৃদয়ের সব সুধা সঞ্চিত করিছো যেথা গোপনের আবরণ টানি',
মনের কামনা মোর একটি কুসুম হ'য়ে সেখানে করুক নমস্কার।

সুদূরিকা

চক্ষে যার বহ্নিরাগ, বক্ষে যার সুমধুর কুসুম-সুষমা,
অন্তরে লুকায়ে রেখো সংগোপনে সেই অন্তঃপুরচারিণীরে ;
সৃষ্টির আনন্দ-মোহে রচিয়াছো অন্ধকারে নব তিলোত্তমা—
সূর্যের দুর্জয় দাহে এনো না টানিয়া তারে নির্লজ্জ বাহিরে।

থাক সে নিশীথরাত্রে পত্রের মর্মর-মাঝে চিরবিরহিণী,
স্মৃদুরিকা হ'য়ে থাক আকাশের নীহারিকা উদার, উদাস,
প্রভাতের তারা হ'য়ে জ্বলুক রূপের রেখা স্বপ্নের সঙ্গিনী,
সুরভির সুরা ঢালি' তুলুক মদির করি' উতল নিশ্বাস।

হারায়ে ফেলো না তারে বাহিরের হর্ম্যভরা হিরণ আলোতে,
মিলায়ে যাবে সে, হায়, ছায়াসম, বাসনার প্রখর কিরণে,
ফেনিল মত্ততা যত সঞ্চরিছে বিষদগ্ধ নীল রক্তস্রোতে,
উদ্বেল উচ্ছ্বাসে তার ভাসায়ে দিয়ো না তব সুন্দর স্বপনে।
লেলিহান লালসারে নিবাইয়ো অশ্রু আনি' তার আঁখি হ'তে,
জ্যৈষ্ঠের নিষ্ঠুর তপ ভাঙিয়ো তাহার স্নিগ্ধ ব্যথার বর্ষণে।

আর-কিছু নাহি সাধ

আর-কিছু নাহি সাধ। জানি, মোর তরে নহে জয়মাল্য, যশের মুকুট,
বিশ্বের কবিরা যত জ্বলিছে নক্ষত্র হ'য়ে রজনীর শ্যামল অঞ্চলে—
সেথা মোর নাহি স্থান। আমার বন্দনা-গান জাগিবে না নীল নভতলে;
মোর করস্পর্শ কভু লভিবে না শ্রদ্ধাসিক্ত অভিষেক-পল্লবসম্পুট।
মানবের চিত্ততীর্থে নিত্যস্বর্গ নহে মোর: মরণের তিক্ত কালকূট
আমার চরম ভাগ্য। একবিংশ শতাব্দীর কোনো সপ্তদশী লীলাচ্ছলে—
মনে জানি—পড়িবে না আমার কবিতাখানি জ্যোৎস্না-স্নাত বাতায়ন-তলে,
সতীর্থের হৃদ্‌পদ্মে গন্ধরূপে ক্ষণিকের স্মৃতিস্বপ্ন--জানি, তাও ঝুট।

তবু যে জাগিছে আজি সংগীত-তরঙ্গ-ভঙ্গ হৃদয়ের হিম সরোবরে—
সে শুধু তোমারি লাগি'। তোমারে যে পেয়েছিনু সর্বদেহে, মর্মে-মনে-প্রাণে,
পেয়েছিনু বিরহের স্পন্দমান অন্ধকারে, মিলনের নিস্পন্দ বাসরে—
সে-কথা কহিতে চাই আকাশেরে, ধরণীরে, তৃণেপত্রে, সমুদ্রের কানে,—
পারি না বহিতে এই পরিপূর্ণতার ভার একা-একা আপন অন্তরে,
সহস্রের মাঝে তাই আপনারে বিতরণ ক'রে যাই লক্ষ গানে-গানে।

কোনো মেয়ের প্রতি

একটু সময় হবে? পাশে গিয়ে বসিবো তোমার।—
(মোদের বাড়িতে বড়ো লোকজন, বিষম বিভ্রাট,
মায়ের মেজাজ চড়া, শিশুগুলি করিছে চীৎকার।)
টবেতে ফুলের চারা তোমাদের বাড়ির সিঁড়িতে,
নতুন সবুজ পাতা নড়িতেছে ঈষৎ হাওয়ায়:
সিঁড়ির সুমুখে ঘর, ছোটো ঘর, ঠাণ্ডা, পরিষ্কার,
শেলাই-কলের কাছে ছোটো টুলে রয়েছো বসিয়া।
সুতো বুঝি ফুরায়েছে? বই খোলা কোলের উপরে,
ভিজে কালো চুলগুলি এলায়ে পড়েছে সারা পিঠে,
শাদা শেমিজেরে ঘিরি' কালো পাড় উঠেছে জড়ায়ে,
শাড়ির চওড়া পাড়, শাদা শাড়ি, মিশকালো পাড়।
ঠিক তব পাশে নয়—তবু কাছে, বসিবো চৌকাঠে—
একটু সময় হবে?

মোদের বাড়িতে বড়ো লোকজন—কোথায় যে যাই।
বাইরে দারুণ রোদ—বেরোতেও সরে না যে মন।
দাঁড়ায়েছি জানালায়—নড়িতেছে নতুন পাতারা,
রাস্তায় এসেছি নেমে—সিঁড়িগুলো টবেতে সাজানো,
রাস্তাটা হয়েছি পার—সব চেয়ে নিচের সিঁড়িটি।
মোরা কাছাকাছি থাকি, রাস্তাটির এপার-ওপার,
তুমি মোর নাম জানো, আমিও জেনেছি তব নাম।
তুমি মোর নাম শোনো, শুনেছি তোমার ডাক-নাম।
আমারে দেখিলে তুমি—পারিবে না?—চিনিতে পারিবে,
আমি তো তোমারে চিনি, মাঝখানে রাস্তাটুকু শুধু—
তারপর শাদা সিঁড়ি, লাল টবে নড়িছে পাতারা।

একটু বসিবো শুধু। থাক, তুমি না-ই বা উঠলে,
ছোটো টুলে ব'সে থাকো, বেশ আছি—এখানে—চৌকাঠে।

ভিজে চুলগুলি দেখে সারা দেহ করিবো শীতল,
ছোটো পা দু-খানি দেখে ক্ষত মন লইবো সারায়ে।
লোকজন জড়ো হোক, প্রাণপণে চ্যাঁচাক শিশুরা,
মায়ের মেজাজ হোক আকাশের রোদের মতন ;—
আমার কী এসে যায় ? তুমি ব'সে আছো মোর কাছে ;
ভিজে তব চুলগুলি ; ঘরখানি ঠাণ্ডা, পরিষ্কার।

কহিবো হালকা কথা—বাজে কথা, তুমি যা বুঝিবে।
(নেহাৎ কহিতে হবে যদি !)
সেদিনের থিয়েটার—আমাদের পাড়ার খবর,
সবচেয়ে রূপসী কে আধুনিক সিনেমা-জগতে,
বব্‌ড্‌ চুল ভালো কিনা। আফ্রিকার জন্তু আর ব্যাধি।
মাঝে-মাঝে হাসিবে না ? ছলছল-ঢেউয়ের মতন।
ছলছল চলে ঢেউ—তার মতো বাজে তব হাসি।
জুড়াবে আমার দেহ ছলছল সেই হাসি শুনে,
জুড়াবে আমার মন ভিজে তব এলোচুল দেখে।—
সিঁড়ির সুমুখে ঘর—ছোটো ঘর— ঠাণ্ডা—পরিষ্কার—
মোদের বাড়িতে বড়ো লোকজন—বিষম বিভ্রাট—
একটু সময় হবে ?

একখানা হাত

আকাশে জমেছে মেঘ ; পথ নিরিবিলি ;
সব চুপ ; রাত দু-পহর।
বাড়িগুলি অন্ধকার পথের দু-ধারে ;
ঘুমায় শহর।

শরীরে জমেছে ক্লান্তি, দুই চোখে ঘুম,
হেঁটে-হেঁটে একা ফিরি বাড়ি।
এখনি আসিবে বৃষ্টি, তাই জোর ক'রে
চলি তাড়াতাড়ি।

হঠাৎ পথের মোড়ে একটি বাড়ির
নিচের ঘরের জানালায়
দেখিলাম, ম্লান-নীল ইলেকট্রিকের
আলো দেখা যায়।

শুধু এই জানালায় আলো জ্বলিতেছে,
অন্ধকার শহর নিরালা,
কাছে এসে চোখ তুলে যেই তাকালাম,
—বুজিলো জানালা।

নিলাম তাহারি ফাঁকে পলকের তরে
একখানা শাদা হাত দেখে—
দুইটি কবাট এসে বুজিলো তখনি
দুই দিক থেকে।

একখানা শাদা হাত, কয়টি আঙুল,
আংটির হীরার ঝলক,
মণিবন্ধে সরু রুলি, ম্লান-নীল আলো,
—চোখের পলক।

আবার দু-চোখ ভ'রে ঘুম জ'মে এলো,
সকল পৃথিবী অন্ধকার :
—এই কথা না-জেনেই মৃত্যু হবে মোর
হাতখানা কার।

এসেছি নিজের ঘরে, বৃষ্টিও এসেছে,
হাওয়ার চীৎকার যায় শোনা ;
যার হাত, কাল তার মুখ দেখি যদি,
আমি চিনিবো না।

বিছানায় শুয়ে আছি, ঘুম হারায়েছে ;
না জানি এখন কত রাত ;
—কখনো সে-হাত যদি ছুঁই, জানিবো না,
এ-ই সেই হাত।

কঙ্কাবতী

তোমার নামের শব্দ আমার কানে আর প্রাণে গানের মতো—
মর্মের মাঝে মর্মরি' বাজে, 'কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কাবতী!'
(কঙ্কাবতী গো।)
দূর সিন্ধুর তরঙ্গ-রোল অমাবস্যায় অনবরত
(অন্ধকারের অন্তর-ভরা ছন্দ-শিহর স্পন্দমান)
সুপ্তির 'পরে স্বপ্নের ঘোরে ফেটে বেজে ওঠে গানের মতো,
অন্ধকারের অন্তর থেকে তরঙ্গ-রোল ইতস্তত
কেঁপে ফুটে ওঠে, ফেটে বেজে যায়, ঢেউয়ের মুখের ফেনার মতো
(কঙ্কাবতী গো)
গড়ায়, ছড়ায় সুপ্তির 'পরে স্বপ্নের ঘোরে সমস্ত রাত :
তেমনি তোমার নামের শব্দ, নামের শব্দ আমার কানে
বাজে দিন-রাত, বাজে সারা-রাত, বাজে সারা-দিন আমার প্রাণে
ঢেউয়ের মতন ইতস্তত ;
ঢেউয়ের মতন গান গেয়ে যায় : 'কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কাবতী।'
কঙ্কাবতী গো!

দিনের স্বপ্নে, রাতের স্বপ্নে তোমার নামের শব্দ শুনি,
(কঙ্কাবতী!)
লোকের চোখের অতীত স্বপ্নে তোমার নামের স্বপ্ন বুনি;
(কঙ্কাবতী!)
গূঢ় গভীর মন্দির-মাঝে ঘণ্টার মতো সুগম্ভীর
পলকে-পলকে ধ্বনি বেজে ওঠে—'কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কাবতী!'
আমার মনের গুহার বুকে :
আমার মনের অনেক গুহার চূড়ায়-চূড়ায় শব্দ বাজে,
চূড়ায়-চূড়ায় ঠেকে ভেঙে যায়, ছড়ায় হাওয়ায় ইতস্তত—
দশ দিক থেকে কথা ক'য়ে ওঠে প্রতিধ্বনি :
গভীর গুহার গহ্বর থেকে গাঢকণ্ঠ প্রতিধ্বনি :
আমার মনের অপার আকাশে হাজার-হাজার প্রতিধ্বনি :
ডাহিনে ও বামে, উপরে ও নিচে, এখানে-ওখানে প্রতিধ্বনি :
প্রতিধ্বনি।
'কঙ্কা—কঙ্কা—কঙ্কাবতী গো—কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কাবতী—'
এখানে-ওখানে প্রতিধ্বনি।

দিনের কাজের হাজার আওয়াজ হাজার হাওয়ার জোয়ারে বহে,
হাওয়ার রথের চাকায়-চাকায় ভেঙে গুঁড়ো হ'য়ে আকাশে রটে
কী কলরোল।
আমি সে-দিনের শব্দের নিচে, আমি সে-কাজেব শব্দের পিছে শুনি,
আমার বুকের হৃদয়ের রোলে, রক্তের তোড়ে, কানে আর প্রাণে শুনি—
(কঙ্কাবতী)
হৃৎ-শব্দের তালে তাল রেখে টিপ টিপ টিপ গান গেয়ে যায়
'কঙ্কা—কঙ্কা—কঙ্কাবতী—
কঙ্কাবতী গো।'
রাতের ঘুমের নীরব সময় মুখর তোমার নামের গানে,
প্রতি মুহূর্ত ফুটে ঝ'রে যায়, ফেটে ম'রে যায় ফুলের মতো,
ফুটে ঝ'রে যায় তোমার নামে,

রাতের ঘুমের প্রতি মুহূর্ত সুখে ফুটে ওঠে তোমার নামে,
প্রতি মুহূর্ত তোমার নামের শব্দে ফোটে ;
কাজের জোয়ারে, ঘুমের সময়ে তোমার নামের শব্দ রটে—
'কঙ্কা—কঙ্কা—কঙ্কাবতী !
কঙ্কাবতী গো !'

মাঝ-রাতে দেখি আকাশের বুকে ঝকঝকে তারা—আলোর পোকা,
আকাশ কোমল।
আকাশ কোমল, আকাশ কালো।
কোমল-কালো সে-আকাশের বুকে ঝকঝকে তারা একশো কোটি
আলোর পাথার আড়ালে তাকায়, আবার লুকায়, তাকায় হঠাৎ,
চোখের পাতার খুব কাছে এসে মিটমিট ক'রে তাকায় হঠাৎ,
আবার লুকায় আলোর পাথার আড়াল টেনে।
আমি মনে ভাবি : তোমার নামের শব্দের সুর ওরাও জানে,
সেই সুরে ওরা ঘুরে-ঘুরে নাচে, দূরে আর কাছে বেড়ায় উড়ে—
ঝিকমিক।
সেই সুরে ওরা কখনো তাকায়, কখনো লুকায়, তাকায় আবার
মিটমিট।
আকাশের বুকে ফুটেছে তোমার নামের শব্দ একশো কোটি,
তোমার নামের শব্দ আমার মনের আকাশে তারার মতো,
ফুটেছে তোমার নামের শব্দ তারার মতন একশো কোটি—
কঙ্কাবতী গো। কঙ্কাবতী গো। কঙ্কাবতী।
তারার মতন একশো কোটি।

আবার কখনো জেগে রয় রাতে একা বাঁকা চাঁদ পশ্চিমেতে,
রাতের নদীতে আরো জেগে রয় আঁকাবাঁকা চাঁদ জলের নিচে ;
পশ্চিম-ভরা আকাশ ফাঁকা।
তারাদের কেউ দেয় নাই দেখা, আকাশ ফাঁকা,
একা জাগে চাঁদ—তা ছাড়া সকল আকাশ ফাঁকা।

শুধু ঐ দূরে দিগন্ত-রেখা যেখানে চলেছে গাছের নিচে,
একসার মেঘ, সরু, এলোমেলো, আঁকাবাঁকা কালো সাপের মতো
গাছের সবুজে জড়ায়ে শরীর রয়েছে প'ড়ে।
আঁকাবাঁকা মেঘ, একা বাঁকা চাঁদ, বাঁকারেখা চাঁদ জলের নিচে,
আঁকাবাঁকা জল, একা বাঁকা চাঁদ, আকাশ ফাঁকা।
আমি চেয়ে থাকি, দেখি চোখ ভ'রে : মনে হয় মোর আঁকাবাঁকা
জলে, মেঘের রেখায়
একা বাঁকা চাঁদ চুপ-চুপ ক'রে কথা ক'য়ে যায় :
ফাঁকা আকাশের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঝ'রে পড়ে স্বর—'কঙ্কা! কঙ্কা!
কঙ্কাবতী!'
সাপের মতন জড়ানো মেঘের বুকে জেগে ওঠে সাপের মতন দ্রুত বিদ্যুৎ,
লাল বিদ্যুৎ, দ্রুত বিদ্যুৎ তোমার নামের শব্দে জাগে;
আকাশ ফাটায়ে লাল বিদ্যুৎ বজ্র বাজায়—'কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কাবতী!'
আকাশের কোন ফাঁকা কোণ থেকে দেখা দেয় এক তাড়ানো তারা
হঠাৎ! হঠাৎ!
খসা তারা এক, মরা তারা এক আগুনের মুখ নিয়ে ছুটে যায়,
অবাক! অবাক!
চোখের পলকে ছুটে চ'লে যায়, ফুলকি ছড়ায়ে জ্ব'লে পুড়ে যায়,
মুখ থুবড়িয়ে উলটিয়ে পড়ে মাটির 'পরে,
উবু হ'য়ে পড়ে ঠাণ্ডা, শক্ত মাটির 'পরে।—
তবু তার পিছে জ্ব'লে চ'লে আসে লাল আলোকের দীর্ঘ রেখা,
সাপের মতন আঁকাবাঁকা রেখা, দীর্ঘ রেখা,
জ্ব'লে চ'লে আসে, কেঁপে-কেঁপে জ্বলে, জ্বলে আর বলে—'কঙ্কা! কঙ্কা!
কঙ্কাবতী!'
এলোমেলো জলে আলো ওঠে জ্ব'লে, ছলছল ঢেউ তোমার নামে
তীরে চুমো খায়, দূরে নিয়ে যায় ঢেউয়ের জলের স্রোতের টানে
তোমার নামের শব্দ, 'কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কাবতী!'
আকাশে ও চাঁদে, জলে আর মেঘে, দিগন্ত-পারে গাছের ছায়ায়,
ফাঁকা আকাশের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, মেঘের শরীরে, জলের স্রোতে—
চুপে-চুপে বলা চাঁদের মুখের কথা

চাঁদের মুখের কথা জেগে ওঠে : কঙ্কাবতী !
আমার মনের কথা বেজে ওঠে : কঙ্কাবতী !
তোমার নামের শব্দ ধ্বনিছে, কঙ্কাবতী !
কঙ্কাবতী গো !

গান

চোখে চোখ পড়েই যদি, নিয়ো না চোখ ফিরিয়ে,
নিয়ো না চোখ নামিয়ে—বাখো এই—একটুখানি।
সীমাহীন এক নিমেষে—খোলা ঐ জানলা দিয়ে
কী আছে তোমার মনে—যা আছে, সব দেখে নিই।
বোলো না, 'একটু সময়—দুটি চোখ—এমন কী আর !'
গালে লাল রং এনো না, তোমাকে মানায় না তা,
ও দেখুক ভোরের আকাশ, এ দেখুক রাতের আঁধার—
আমার এ একটু সময়—কালো চোখ, কোমল পাতা।
কালো চোখ আলোক-ভরা, ছায়াময় কোমল পাতা,
আলো আর ছায়ার ছবি—ঝিকিমিক আমার চোখে,
নিয়ো না চোখ ফিরিয়ে—যা বলে বলুক লোকে—
চোখে চোখ পড়বে যখন।

মুখে মুখ রাখিই যদি, এমন আর দোষ কী, বলো ?
মনেরে যায় না ছোঁয়া, কেমনে চাখবো তারে।
দুটি ঠোঁট—ফুরফুরে ঠোঁট, টুকটুক-রঙিন হ'লো,
ঠোকরাই পাখির মতো, খুটখুট চার কিনারে।
চারিদিক ঠুকরিয়ে খাই, দুটি ঠোঁট ফলের মতো,
ঐ মুখ ফুলের মতো ফুটেছে আমার পানে ;
খুলে দাও চুলের বোঝা ঝপাঝপ ইতস্তত,
ফুটফুট নরম বুকে টেনে নাও বাহুর টানে।

টেনে নাও আমায় তুমি ফুটফুট নরম বুকে,
হৃদয়ের গোপন কথা টিপটিপ নরম বুকে,
শোনো ঐ কইছে কথা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়!
গড়িয়ে পায়ের নিচে ব'য়ে যায় অসীম সময়—
মুখে মুখ রাখলে পরে।

আমন্ত্রণ—রমাকে

তুমি এখানে কখনো যদি আসবে, মেয়ে
শোনো, আসবে কখন;
যবে আঁধার নামবে শাদা আকাশ ছেয়ে,
কালো আঁধার নামবে লাল আকাশ ছেয়ে,
যবে সন্ধ্যাতারার মুখ থাকবে চেয়ে
মোর মুখের পানে
নির্- নিমেষ নয়ন—
যবে জাগবে বাতের হাওয়া উতল গানে—
তুমি আসবে তখন।

মানে— আসবে এখানে তুমি সন্ধ্যা হ'লে—
তুমি লক্ষ্মী মেয়ে!
মেশা উষ্ণ তুষার তব লাল কপোলে,
মাখা সুর্মা তোমাব কালো চোখের কোলে,
শাদা গলায তোমার শাদা মুক্তা দোলে,
ঘন নীলাম্বরী
শাদা শরীর ছেয়ে।
এনো স্বপ্ন তোমার কালো নয়ন ভরি',
এসো, লক্ষ্মী মেয়ে।

আমি ধরবো দু-হাত তব নিমেষ-তরে
তুমি আসবে যখন;

তব　　নাম ধ'রে ডেকে তোমা আনবো ঘরে,
যাবে　　চুলের সুবাসে তব বাতাস ম'রে ;
শাদা　　আলোক প'ড়ে নীল শাড়ির 'পরে
　　কেঁপে　উঠবে সুখে—
　　তুমি　আসবে যখন।
হেসে　　তাকাবো গোলাপ-ফোটা তোমার মুখে
　　শাদা　তুষার-বরন।

আমি　　বসাবো তোমাকে মোর ইজি-চেয়ারে,
　　আমি　বসবো পাশে।
ঘরে　　জ্বলবে মোমের আলো এক কিনারে,
আর　　জ্বলবে সন্ধ্যাতারা আকাশ-পারে,
আর　　জ্বলবে স্বপ্ন তব আঁখির ঠারে ,—
　　কালো　আঁখির কোলে
　　শাদা　আলোক ভাসে ;
মোর　　হৃদয়ের তোলপাড় শান্ত হ'লে
　　আমি　বসবো পাশে।

ঢের　　গল্প-গুজব হবে তোমায়-আমায়
　　শুধু　আমরা দু-জন ;
নয়া　　চুলের ফ্যাশন থেকে সাহিত্য যায় ;
হাসি　　ফুটবে ফুলের মতো চোখের কোণায়,
হাসি　　কাঁপবে আলোর মতো অধর-সীমায়—
　　লাল　ঠোঁটের 'পরে—
　　কালো　নয়ন-মগন !
শত　　গহন স্বপনে ঘন নয়ন ভ'রে
　　হাসি　ফুলের মতন।

আমি　　বলবো তোমাকে ঢের মিথ্যে কথা—
　　তুমি　শুনবে, মেয়ে ;

তব   শরীর—অন্ধকারে বিজলী-লতা,
নীল   শাড়িতে মেঘের ঘন তমিস্রতা ;
দুই   বাহুতে জলের মতো উচ্ছলতা,
    শত   কবির স্বপন
    তব   নয়ন ছেয়ে।
তব   নয়নে মরণ,তব চরণে মরণ !—
    তুমি   শুনবে মেয়ে।

তুমি   বলবে আমাকে ঢের মিথ্যে কথা,
    আমি   শুনবো, মেয়ে।
তব   স্বর্গের অর্ঘ্যের আমি দেবতা,
তব   হৃদয়-গগনে আমি তপন-যথা,'
তব   হৃদয়-সাগরে চির-চঞ্চলতা—
    চোখে   ফুটলো আলো
    মোর   নয়নে চেয়ে ,—
ম্লান   মোমের আলোয় মোরে বাসবে ভালো—·
    তুমি   লক্ষ্মী মেয়ে।

তুমি   মোমের আলোয় ভালোবাসবে মোরে—
    মোরা   পড়বো প্রেমে,
ভালো-   বাসবো তোমায় আমি হৃদয় ভ'রে
এক   তারকা-ফোটা ঘন সন্ধ্যা ধ'রে,
মোরা   বাসবো, বাসবো ভালো পরস্পরে ,
    দূর   আকাশ থেকে
    প্রেম   আসবে নেমে।
প্রেমে   নাম ধ'রে ঘরে মোরা আনবো ডেকে,
    মোরা   পড়বো প্রেমে।

মধ্যরাত্রে

'Pray but one prayer for me 'twixt thy closed lips,
Think but one thought of me up in the stars.'

WILLIAM MORRIS

ভাবিয়ো আমার কথা একবার তারা-ভরা আকাশের তলে,
কহিয়ো আমার নাম একবার নিশীথের বাতাসের কানে ;
নয়ন তুলিয়া তব চাহিয়ো একটিবার আকাশের পানে,
একবার মুখ তুলে ডাকিয়ো আমার নাম বাতাসের কানে।
আকাশে তারার ভিড়, আকাশে রুপার রেখা বাঁকা চাঁদ জ্বলে ;
রজনী গভীর হয় ; বাতাসে মদির গন্ধ , চাঁদ পড়ে ঢ'লে—
চাঁদের রুপালি রেখা লাল হ'য়ে ঢ'লে পড়ে পশ্চিমের কোলে।
রজনী গভীর হয় ; আকাশ আঁধার হ'য়ে আসে পলে-পলে—
ক্লান্ত চাঁদ ঢ'লে পড়ে, ক্লান্ত আঁখি ঢুলে আসে আকাশের তলে।
ভাবিয়ো আমার কথা একবার তারা-ভরা আকাশের তলে,
কহিয়ো আমার নাম একবার নিশীথের বাতাসের কানে।
বাতায়নে তারা জাগে, চাঁদের রুপালি আলো শয়ন-শিথানে,
শিশিরের মতো ঘুম ঝ'রে পড়ে নিশীথের আকাশের তলে,
নয়ন জড়ায়ে আসে, নয়ন ভরিয়া যায় স্বপ্নের ফসলে ;
রাতের ঘুমের আগে কহিয়ো আমার নাম বাতাসের কানে,
কহিয়ো আমার নাম ভালোবেসে একবার বালিশের কানে,
রাতের ঘুমের আগে ভাবিয়ো আমার কথা আকাশের তলে,
ভাবিয়ো আমার কথা ভালোবেসে একবার জানালার তলে ,
নয়ন মেলিয়া তব চাহিয়ো একটিবার জানালার পানে,
একবার মুখ খুলে ডাকিয়ো আমার নাম বালিশের কানে ;
তারপর চোখ বুজে দেখিয়ো আমার মুখ আঁধারের তলে,
দেখিয়ো আমার মুখ একবার ঘুমে-ভরা আঁধারের তলে—
রাতের ঘুমের আগে দেখিয়ো আমার মুখ নয়নের তলে,
দেখিয়ো আমার মুখ একবার নয়নের পল্লবের তলে।

—কহিয়ো আমার নাম একবার নিশীথের বাতাসের কানে,
ভাবিয়ো আমার কথা একবার তারা-ভরা আকাশের তলে,
—তারা-ভরা আকাশের, তারা-ঝরা জানালার তলে,
নিশীথের বাতাসের, ঘুমে ভরা বালিশের কানে।

বিরহ

ভ্রমর, ওরে ভ্রমর, কত করবি গুনগুন!
ঘরের মধ্যে জ্বালিয়ে দিলি সংগীতের আগুন।
গান যেন তোর ব্যর্থ না হয়, ঈশ্বর করুন।

ভ্রমর, ওরে ভ্রমর, তুই একটু চুপ কর,
বুকের মধ্যে শুনছি আমার আর-একজনের স্বর,
তোরি মতন দুপুর ভ'রে করতো যে গুনগুন।

ভ্রমর, কালো ভ্রমর, ওরে ভ্রমর উতলা,
তোকে শুনে ব্যথা যে আর সইতে পারি না—
ব্যথা আমার ব্যর্থ না হয়, ঈশ্বর করুন।

আর-বছরে জ্বলেছি তার গানের আগুনে,
কোথায় গেলো গানের রানী এবার ফাগুনে,
গান যেন তার ব্যর্থ না হয়, ঈশ্বর করুন।

ভ্রমর, ওরে ভ্রমর, আমি আজকে একেলা,
বুক ঠেলে যে কান্না ওঠে, সইতে পারি না।
আমার কাছে আর কত রে করবি গুনগুন!

ভ্রমর, কালো ভ্রমর, ফিরে আসিস আর-বছর,
চুপ ক'রে তুই শুনবি তখন আর-একজনের স্বর।
প্রার্থনা মোর ব্যর্থ না হয়, ঈশ্বর করুন।

এই শীতে

আমি যদি ম'রে যেতে পারতুম
এই শীতে,
গাছ যেমন ম'রে যায়,
সাপ যেমন ম'রে থাকে
সমস্ত দীর্ঘ শীত ভ'রে।

শীতের শেষে গাছ নতুন হ'য়ে ওঠে,
শিকড় থেকে উর্ধ্বে বেয়ে ওঠে তরুণ প্রাণরস,
ফুটে ওঠে চিক্কণ সবুজ পাতায়-পাতায়
আর অজস্র উদ্ধত ফুলে।

আর সাপ ঝরিয়ে দেয় তার খোলশ,
তার নতুন চামড়া শঙ্খের মতো কাজ-করা,
তার জিহ্বা ছুটে বেরিয়ে আসে আগুনের শিখার মতো,
যে-আগুন ভয় জানে না।

কেননা তারা ম'রে থাকে
সমস্ত দীর্ঘ শীত ভ'রে,
কেননা তারা মরতে জানে।

যদি আমিও ম'রে থাকতে পারতুম—
যদি পারতুম একেবারে শূন্য হ'য়ে যেতে,
ডুবে যেতে স্মৃতিহীন, স্বপ্নহীন অতল ঘুমের মধ্যে—
তবে আমাকে প্রতি মুহূর্তে ম'রে যেতে হ'তো না
এই বাঁচবার চেষ্টায়,
খুশি হবার, খুশি করবার,
ভালো লেখবার, ভালোবাসার চেষ্টায়।

তুমি যখন চুল খুলে দাও

তুমি যখন চুল খুলে দাও
ভয়ে আমি কাঁপি।

তুমি যখন চুল খুলে দাও,
ভেসে আসে তোমার চুলের গন্ধ,
গুনগুন ক'রে গান করো তুমি,
ভয়ে আমার বুক কাঁপে।

গুনগুন ক'রে গান করো তুমি
আমার পাশে ব'সে :
তোমার মুখ দেখা যায় না,
বুকে এসে লাগে চুলের গন্ধ
ভয়ে আমার বুক কাঁপে।

তোমার মুখ ফেরানো :
তোমার কালো চুল বেয়ে পড়ে,
তোমার কালো চুল বেয়ে ওঠে
আমার হৃদয় জড়িয়ে—
ভয়ে আমি মরি।

তুমি যখন চুল খুলে দাও
ভয়ে আমি কাঁপি।

স্পর্শের প্রজ্জ্বলন

এমন দিনে তারে বলা যায়,
আজকের মতো এই বর্ষার দিনে।

কিন্তু বলবার কিছু নেই যে।
এখন আর
কিছু বলবার কথা নেই;
এখন শুধু স্পর্শের স্বাক্ষর,
স্পর্শের প্রজ্জ্বলন।

স্পর্শ, স্পর্শ!
আগুনের শাঁস,
ঈশ্বরের শরীর।
এখন আর কিছু বলবার নেই।
এখন শুধু স্পর্শের লাল ফুলের উন্মীলন।

কেন আমি একা?
কেন আমার বুকের মধ্যে এই বর্ষার হাওয়ার হাহাকার?
কেন তুমি একা,
তোমার মুখ অমন ম্লান কেন, কেন তোমার চোখের নিচে ক্লান্তির কালো ফুল?

কেন আমাদের মাঝখানে এই মানুষের দেয়াল?

বিনাযুদ্ধে জয়ী

সংসার, তুমি আমাকে ভয় দেখাও,
তুমি আমাকে পিষে মারতে চাও
টাকা না-থাকার কি টাকা থাকার ভাবনা দিয়ে,
যা একই কথা।

কিন্তু আমি তোমাকে এড়িয়ে যাবো,
চ'লে যাবো তোমাকে পাশ কাটিয়ে, সংসার—
না, যুদ্ধ করবো না ; তোমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে নষ্ট করতে পারি
এমন সময় আমার কোথায় ?

যেটুকু সময় তোমাকে না দিলেই নয়, তা আমি দেবো,
নিজের যেটুকু না দিলে আমি বাঁচতে পারবো না, সেটুকু দেবো তোমাকে—
ঠিক সেটুকু, তার বেশি নয়।

আমার সময় নেই।
জানলার বাইরে আছে আকাশের নীল টুকরো,
আছে সমস্ত দিন ভ'রে মনের মধ্যে কবিতার গুঞ্জন,
আছে, কোনোখানে, একটি মেয়ের কালো চুল।

আমার সময় নেই।
তুমি আমাকে ভয় দেখাতে পারো, যত খুশি,
যেটুকু তোমাকে না দিলেই নয়, তার বেশি কিছুতেই আমি দেবো না,
তার বেশি দিতে আমি পারিনে।

আমি আছি।
আছে আমার নিজের জীবন।
সে-জীবন আমাকে নিতেই হবে
সে-জীবন আমাকে নিতেই হবে,
যতই তুমি আমাকে ভয় দেখাও, সংসার,
যতই না আমাকে পিষে মারতে চাও টাকা থাকার কি টাকা না-থাকার
ভাবনা দিয়ে।

নতুন দিন

আজ পৃথিবী আমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে
তার সমস্ত মধুরতা নিয়ে।

সমস্ত মধুরতা, সমস্ত কোমলতা—
যেন এই নতুন বসন্তের হাওয়া তার শরীর।

আর আমার মধ্যে কী যেন ভেঙে যাচ্ছে,
পাথর যেমন ভেঙে যায় পৃথিবীর অন্তর্লীন ভীষণ আগুনের চাপে।

আর আমার মধ্যে কী যেন গ'ড়ে উঠছে, জ'মে উঠছে,
যেমন কাঁচা আম আর ক-দিন পরে আরক্ত হ'য়ে উঠতে থাকবে
সূর্যের হিংস্র চুম্বনে।

এ কী আশ্চর্য মৃত্যু!
এ কী আশ্চর্য নতুন জন্ম!

নতুন সুর এসেছে জীবনে।
রক্ত জলছে আমার দু-হাতে, লাল আগুনের মতো,
কেননা তুমি তাদের স্পর্শ করেছো।

আমি ভুলে গিয়েছিলুম জীবনে এত মধুরতা,
এত কোমলতা,
আমার মনে ছিলো ভয়, কঠিন, বিবর্ণ ভয়।
কাকে আমি ঘা দিতে গিয়েছিলুম আমার বিদ্রূপে?
কাকে আমি মারতে গিয়েছিলুম আমার নিষ্ঠুরতায়?
—আমি আমার হৃৎপিণ্ড উপড়ে আনতে চেয়েছিলুম
নিজের হাতে।

সেই হাত তুমি স্পর্শ করলে।
আর সে কখনো সাপের ফণা হ'য়ে উঠতে পারবে না।
এর পর থেকে, সে-হাতকে হ'তেই হবে মধুর,

হ'তেই হবে রক্তের তাপে জীবন্ত,
কেননা এর পর থেকে সে-হাত তোমার।

আজ আমি বুঝতে পারছি
কোন অদৃশ্য অন্ধকারে আমাদের জীবনের উৎস :
আর আমার জানলায় ছোটো-ছোটো তুলসীর পাতা,
তারা ভ'রে উঠছে জীবনের সমস্ত মধুরতায়।
আর এই রাত্রি নাচছে আমার রক্তে
জ্বলন্ত কোনো তারার আকাশ-পরিক্রমণের মতো।

দেবতা দুই

(অংশ)

(২)

দেবতা শুধু নিষ্ঠুর নন,
দেবতা শুধু বজ্রের নন,
দেবতা শুধু মৃত্যুর নন :

দেবতা উৎসবের
দেবতা বসন্তের
দেবতা চুম্বনের।

বজ্রের যিনি দেবতা
তিনি আমাদের বুকের মধ্যে বাজেন ভীমগম্ভীর স্বরে,
তাঁর প্রতিধ্বনিতে ফেটে যায় শরীরের দেয়াল,
আমরা ম'রে যাই।

তারপর চুম্বনের দেবতা আমাদের বাঁচিয়ে তোলেন,
নতুন হ'য়ে আমরা জেগে উঠি,
আমাদের শরীরে তাঁর ঐশ্বর্য, তাঁর মহিমা।

বজ্রের যিনি দেবতা তাঁকে প্রণাম করি,
তিনি ভয়ংকর ;
চুম্বনের যিনি দেবতা তাঁকে ভালোবাসি,
তিনি অপরূপ।

দেবতা শুধু মৃত্যুর নন, দেবতা উৎসবের,
দেবতা শুধু বজ্রের নন, দেবতা চুম্বনের।

জন্ম

তোমাকে বুকে ক'রে, তোমাকে বুকে ভ'রে কাটে আমার রাত্রি।
সমস্ত চিরকাল সেই উত্তাল অন্ধকার-মন্থিত মুহূর্তে
থমকে দাঁড়ায়— যেন পথ হারায় অন্ধ অবায়ু চিরায়ু মহাশূন্যের যাত্রী—
কোন উদ্যত খড়্গের মতো আমার উত্তপ্ত মাংসের মধ্যে খুঁড়তে।

তোমাকে বুকে রেখে, তোমার মুখের মধ্যে ঢেকে আমার মুখের আহত,
বিক্ষত ক্লান্তি
প্রতি নিশ্বাসে আমি নিঃশেষে শোষণ করি তোমার রাত্রির শক্তির উৎস :
হে চোখ-ধাঁধানো চূড়া! আমার দৃষ্টি যে ফুরায়—এ কী জলন্ত অশান্তি,
এ কী শান্তি!
হে অদৃশ্য, কবোষ্ণ বন্যা, স্পর্শময় প্রাণ-ঝরনা, কোন সংগোপন সুরঙ্গ থেকে
তুমি উঠছো!

আগ্নেয়, দুঃসহ, তীব্র, উত্তাল, বিশাল এই রাত্রি।
কাঁপে পাহাড়, ভাঙে কঙ্কাল-হাড়, জাগে সুরঙ্গে জোয়ার, অদম্য।
হে দৃষ্টি-অন্ধ-করা যুগ্ম চূড়া, এ কোন যজ্ঞ? বলো, তুমিই কি ধাত্রী
দিগন্তে ঘুমন্ত সূর্যের? হে অন্ধকার, তুমি কি মৃত্যুর, তুমি কি জন্মের সিংহদ্বার?
এ কী অসহ্য মৃত্যু! এ কী উজ্জ্বল, অলজ্জ নব জন্ম!

এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে

এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে, এই পৃথিবীর।
একদিকে আমি, অন্যদিকে তোমার চোখ শুব্ধ, নিবিড় ;
মাঝখানে আঁকাবাঁকা ঘোর-লাগা রাস্তা এই পৃথিবীর।

আর এই পৃথিবীর মানুষ তাদের হাত বাড়িয়ে
লাল রেখা আঁকতে চায়, তোমার থেকে আমাকে ছাড়িয়ে
জীবন্ত, বিষাক্ত সাপের মতো তাদের হাত বাড়িয়ে।

আমার চোখের সামনে স্বর্গের স্বপ্নের মতো দোলে
তোমার দুই বুক ; কল্পনার গ্রন্থির মতো খোলে
তোমার চুল আমার বুকের উপর , ঝড়ের পাখির মতো দোলে

আমার হৃৎপিণ্ড , আমরা ভয় করবো কাকে ?
আমরা তো জানি কী আছে এই রাস্তার এর পরের বাঁকে—
সে তো তুমি—তুমি আর আমি : আর কাকে

আমরা দেখতে পাবো ? আমার চোখে তোমার দুই বুক
স্বর্গের স্বপ্নের মতো , তোমার বুকের উপর উত্তপ্ত, উৎসুক
আমার হাতের স্পর্শ , কূল ছাপিয়ে ওঠে তোমার দুই বুক

আমার হাতের স্পর্শে, যেন কোনো অন্ধ অদৃশ্য নদীর
খরস্রোত , তার মধ্যে এই সমস্ত দুরন্ত পৃথিবীর
চিহ্ন মুছে যায় , শুধু এই বিশাল অন্ধকার নদীর

তীব্র আবর্ত, যেখানে আমরা জয়ী, আমরা এক, আমি
আর তুমি—কী মধুর, কী অপরূপ-মধুর এই কথা—
তুমি—তুমি আর আমি।

দয়াময়ী মহিলা

আমার দুঃখ দেখে দয়া হয় কি তোমার
দয়াময়ী মহিলা ?
তাই কি আমার কাছে আসতে চাও—
দয়াময়ী মহিলা !

থাক, দাঁড়াও ওখানেই, মুখ ফেরাও,
করুণাময়ী !
মরতে দাও আমাকে একা, কিন্তু তোমার
ঐ দয়ার দেবীত্বের লীলা

তা থেকে আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও।
ফিরে যাও, হে দেবী, ফিরে যাও
যেখানে তোমার স্বরক্তের শাখা-প্রশাখা,
তোমার উৎস, তোমার মূল,

যেখান থেকে দয়া ক'রে এসেছিলে
আমাকে একা দেখে, ভালোবেসে,
আমাকে ভালোবেসে—কী ভুল।

কে চায় তোমার ভালোবাসা, কে চায়।
তোমার ঐ শাদা দয়ার ভালোবাসা কে চায়, বলো !
নিয়ে যাও, ফিরিয়ে নিয়ে যাও, হে দেবী-অতিথি—
কেঁদো না, ঐ তোমার চোখের ছলোছলো

করুণ দৃষ্টি অনেক মেরেছে আমাকে।
কাঁদতে-কাঁদতে তুমি এসেছিলে—কেন এলে ?
অত কান্নার দাম আমার মধ্যে নেই,
সত্য ক'রে বলি।

এখন আর কেঁদো না, যাও ; ফিরে-ফিরে
আর তাকিয়ো না ; আমিও
অনেক কেঁদেছি, অনেক ; বুক ভেঙে গেছে ,
তোমার করুণার অমিয়

সে-ফাটা জোড়া লাগাবে না , যাও তুমি,
যেখানে তোমার শান্তির ছায়া,
তোমার জন্ম-তরুর মূল আর শাখা।
—আমার রাস্তায় অনেক কাঁটা, অনেক আঁকাবাঁকা।

আমার মধ্যে শান্তি পাবে না এ তো জানতেই।
আমি ক্ষুধিত, আমি অস্থির, আমি নিষ্ঠুর,
চীৎকার ক'রে আমি চাই, চাই, চাই,
হয়তো কোনদিন ভেঙে ফেলতুম তোমার মধুর

দেবী-প্রতিমা, লোকে ছী-ছি বলতো। যাক, ভালোই হ'লো,
এ-খেলা যে ভাঙলো, ভালোই হ'লো।
এবার তো দেখলে আমার চরম নগ্নতা—
কী হিংস্র আমি, নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর।

নির্লজ্জের মতো চেয়েছিলুম তোমাকে
সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র তুমি।
আর-কেউ নয়, আর-কিছু নয়, শুধু তুমি—
তুমি !

আর তুমি কি চাও আমাকে সমস্ত পৃথিবীব সঙ্গে মিলিয়ে,
কোনোখানে একটু খোঁচ থাকবে না, একটু চিড়।
নিজেকে হাজার টুকরো ক'রে দেবো বিলিয়ে

যত-কিছু তুমি ভালোবাসো, সবার মধ্যে,
নানা আয়োজনে, নানা অনুষ্ঠানে,

রীতিপালনে, নিয়মরক্ষায়। সবই সুন্দর,
ছন্দের সুষমায় গাঁথা! —নিতে আমাকে কুড়িয়ে,

ভাঙা টুকরোগুলো ভালোবাসার সুতো দিয়ে গেঁথে।
ক্ষমা করো আমাকে—অন্য সব ভালোবাসা আমার গেছে ফুরিয়ে

তোমাকে ভালোবেসে। নির্বোধের মতো চেয়েছিলুম তোমাকে
সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে—তুমি আমার, আমার!
ছ্যাখো, এই তো আমার ভালোবাসা, যা আমি দিতে পারি,

এতে উন্মত্ততা, এতে সর্বনাশ। এ কি তোমার সইবে?
আমার চুম্বনের ধারে তুমি কি ছিঁড়ে যাবে না?
ভয় নেই—আমিও ছিঁড়ে গেছি আমার বাসনার ধারে।

ভয় নেই তোমার, তুমি যাও,
যাও, ছলোছলো চোখে ফিরে-ফিরে চেয়ো না,
একা মরতে দাও আমাকে।

জানি তোমার ছলোছলো চোখ, জানি কান্না,
আমারও বুক কান্নায় ভেঙে গেছে।
এখন আমার ভাঙাচোরা টুকরোগুলো কুড়িয়ে

তুমি কি দয়া দিয়ে বাঁচাতে চাও? যাও, এগিয়ে যাও,
হাওয়ায় তোমার কালো চুল দাও উড়িয়ে,
ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাক তোমার বুকের ঠাণ্ডা দয়া।

হও নিষ্ঠুর, তোমার ভালোবাসা যাক ফুরিয়ে,
ভয় কোরো না। তবু হোক তোমার বুক আগুনের উৎস,
আমাকে পোড়াও আগুনের ঝরনায়, যদি পারো,
তোমার ঘৃণার চাবুকে মারো আমাকে, মারো,

হও স্ত্রী, হও স্ত্রীলোক—মায়ার শ্বেত দেবী নয়,
নয় নিয়মের ছন্দে ঢালা মহিলা!
অনেক দেখেছি তোমার-দয়া-শ্বেত ভালোবাসার লীলা—
আর নয়!

চিল্কায় সকাল

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়
কেমন ক'রে বলি।

কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর,
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে :

কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে ;
চারদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় ধোঁয়াটে,
মাঝখানে চিল্কা উঠছে ঝিলকিয়ে।

তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তারপর গেলে ওদিকে,
ইস্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ই দেখতে।
গাড়ি চ'লে গেলো। —কী ভালো তোমাকে বাসি,
কেমন ক'রে বলি।

আকাশে সূর্যের বন্যা, তাকানো যায় না।
গোরুগুলো একমনে ঘাস ছিঁড়ছে, কী শান্ত।
—তুমি কি কখনো ভেবেছিলে এই হ্রদের ধারে এসে আমরা পাবো
যা এতদিন পাইনি।

রুপোলি জল শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ
নীলের স্রোতে ঝ'রে পড়ছে তার বুকের উপর

সূর্যের চুম্বনে। —এখানে জ্ব'লে উঠবে অপরূপ ইন্দ্রধনু
তোমার আর আমার বুকের সমুদ্রকে ঘিরে
কখনো কি ভেবেছিলে ?

কাল চিল্কায় নৌকোয় যেতে-যেতে আমরা দেখেছিলাম
দুটো প্রজাপতি কত দূর থেকে উড়ে আসছে
জলের উপর দিয়ে। —কী দুঃসাহস! তুমি হেসেছিলে, আর আমার
কী ভালো লেগেছিলো।

তোমার সেই উজ্জ্বল অপরূপ মুখ। ভাখো, ভাখো,
কেমন নীল এই আকাশ। —আর তোমার চোখে
কাঁপছে কত আকাশ, কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম
কেমন ক'রে বলি।

পাণ্ডুলিপি

অজীর্ণ রোগে শীর্ণ, মগজে
পক্ষপাতী পাটিগণিত ঠাশা;
মাথার অল্প চুল তেলে চিকচিকে,
চোখ দুটো ধূর্ত, লোভে হলদে।
সে তার তেল-চিটচিটে, স্যাঁৎসেঁতে আঙুল দিয়ে
নেড়ে-চেড়ে দেখছে আমার পাণ্ডুলিপির
হংস-শুভ্র পাতাগুলো,
যা এর আগে আমি ছাড়া কেউ ছোঁয়নি;
আর তার ধূর্ত চোখের ছোটো-ছোটো গর্ত
আমার দিকে মিটমিট ক'রে বলছে—
'এ-বই আপনার চলবে তো ?'

মনে পড়লো সারা রাত জেগে এই বই যখন শেষ করেছিলুম।
নিজেকে মনে হয়েছিলো দেবতা, কী অপরূপ!

যেন এই শাদা পাতাগুলো দিয়ে ছোটো একটি সূর্য আমি তৈরি করেছি,
একটি সূর্য, আমারই প্রাণে জ্বলন্ত।
আর সেই কাক-ভোরে
বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ
ঘুমোতে পারিনি আনন্দে।
যে গাইতে পারে তার গলা বেয়ে যেমন ওঠে গান,
তেমনি আনন্দ উঠছিলো আমার বুক ঠেলে।
ক্লান্ত শরীর, চোখে ঘুমের তৃষ্ণা, তবু আনন্দে
ঘুমোতে পারিনি।

আর তারপর এই ধূর্ত চোখের ছোটো-ছোটো মিটমিটে গর্ত
আর লোভে-চিটচিটে ছুটো থাবা
আমার সূর্য-শুভ্র পাণ্ডুলিপিটা চটকাচ্ছে।

ভেবেছিলুম একটা মির‍্যাকল ঘটবে, ঘটলো না।
ফেটে পড়লো না আমার ছোটো সূর্য, দারুণ বিস্ফোরণে।
সে তার নোংরা স্যাঁৎসেঁতে আঙুলগুলো রাখলো আমার লেখার গায়ে—
তবু বেঁচে রইলো।

অবাক হ'য়ে গেলুম।

বৃষ্টি আর ঝড়

বৃষ্টি আর ঝড়, বৃষ্টি আর ঝড়, রাত্রি আর দিন।
দিন ধূসর, বন্ধ্য, অন্ধকার। আলো নেই
ছায়াও নেই। শুধু বৃষ্টির কুয়াশা, শুধু মেঘের আবছায়া, আর
ট্র্যামের গোঙানি, ট্র্যাফিকের ঘর্ঘর।

আকাশে চাপা কান্না, হাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস।
দীর্ঘ দীর্ঘ দিন, রাত্রি কত দূর?

ক্লান্ত প্রহর, মুহূর্ত মন্থর ; কালের শৃঙ্খল-ঝঞ্চনা
অন্তহীন, ক্লান্তিহীন।

রাত্রি ; ঘরে শূন্যতা, বাইরে অন্ধকার,
বৃষ্টি আর ঝড়, বৃষ্টি আর ঝড়।
শূন্য শূন্য হৃদয়, ব্যর্থ ব্যর্থ রাত্রি,
শুধু ক্রুদ্ধ শহরের ঘুমহীন গুমরানি।

হৃদয়ে শূন্যতা, শহরে আর্তস্বর, আকাশে অন্ধকার।
ছায়া, হাওয়া, স্বর, মর্মর, ক্রুদ্ধ রুদ্ধস্বর, দীর্ণ দীর্ঘশ্বাস
শহরে, শূন্য ঘরে, বৃষ্টি-ঝরা অন্ধকারে, কালের শৃঙ্খল-ঝংকারে
সারা রাত্রি, সারা দিন।

দিন শূন্য, পচা ডোবার মতো চুপচাপ। রাত্রিও বোবা,
কিছু নেই। নেই নেই।
বৃষ্টির ধূসর কাপড়ে, বাতাসের শহরের আর্ত স্বরে
সৃষ্টির মুখ ঢাকা। কিছু নেই। আমি একা একা।

কালের বিশাল চাকায় অন্ধ মাছির মতো বন্দী,
বিশ্বের জানলা বন্ধ, অন্ধকার, রুদ্ধশ্বাস,
পচা ডোবার মতো দিন, পুরোনো বিস্মৃত কুয়োর তলার মতো
রাত্রি, আর নিঃশেষ নিঃসঙ্গতা, শেষহীন।

রাস্তায় ভিড় ব্যস্ততা মত্ততা। আপিসে ময়দানে রেস্তোরাঁয়
কাজ খেলা নেশা, হাড়-ভাঙা সপ্তাহশেষে জুয়ো, জিন, দুপুরের ঘুম
সব অস্পষ্ট, আড়ষ্ট, শহর মূর্ছিত। বৃষ্টি,
বৃষ্টি। রাস্তায় ছায়ার ঠেলাঠেলি, দুঃস্বপ্নের হাড়হীন মিছিল।

অকায়, অকঙ্কাল কলকাতা, ছায়াময়, স্বপ্নের মতো
স্বেচ্ছাচারী, দায়িত্বহীন। আমিও ছায়া, হাওয়ার ছোঁওয়ায়
কাঁপি দেয়ালে, পরদার আড়ালে, দোলে আমার বুকের মধ্যে
বৃষ্টি আর ঝড়, বৃষ্টি আর ঝড়, রাত্রি আর দিন।

দময়ন্তী

বিনয় বৃদ্ধের বিদ্যা। দাম্ভিক যৌবন
মনে করে সূর্য তারই সম্ভোগের পথের প্রদীপ,
তারার সেনানী তারই রতি-হ্রস্ব রাত্রির পাহারা।
উদ্ধত সে,
নগণ্য সংকল্প তার নষ্ট হ'লে অদৃষ্টের দোষে
বিশ্বে নিন্দে, আপনারে অক্ষম ধিক্কারে
ক্ষত করে :
'আমি হৃতস্বার্থ, তাই সূর্য কেন্দ্রচ্যুত।'

সহস্র বসন্ত ছিলো আমার যৌবন।
সহস্র চৈত্রের রাত্রি চৈত্ররথ-বনে
কাটায়েছি। সেই রাত্রি, পুঞ্জ-পুঞ্জ বসন্তের মন্থিত অমৃত
যেদিন শরীরে তোর মুঞ্জরিবে, রে কন্যা আমার,
তোর পাণিপ্রার্থী হ'য়ে দেবত্রয় আসিবে সেদিন,
স্বয়ং মহেন্দ্র, অযোনিজ অগ্নি, কালান্তক যম।

স্বর্গ তোরে চায়, যজ্ঞ তোরে চায়, মৃত্যু তোরে চায়।
কিন্তু যৌবনের জাদু স্বর্গ রচে জঙ্ঘার গুহায়,
নাভিমূলে যজ্ঞবেদী, মৃত্যু আরো নিচে।
একদিন হংসদূত এসে
তারই সংগোপন মন্ত্র জ'পে গেছে তোর কানে-কানে,
শুনায়েছে প্রিয়তম নাম।
'প্রণাম, প্রণাম,
দেবগণ, ক্ষমা করো, ত্রাণ করো বিপন্নারে,
যেন চিনি তারে
সহস্র নলের মধ্যে, এই বর দাও।'

ফিরে যাবে দেবগণ। ওরে দেববিজয়িনী
যৌবনগর্বিণী কন্যা,

রে কন্যা আমার,
সেদিন মুখশ্রী তোর পূর্ণিমার মতো
আকর্ষিবে উচ্ছল অশ্রুর বেগ দু-জনের চোখে—
নয়, নয় বিচ্ছেদের শোকে,
আনন্দে, স্মৃতির স্রোতে, অতীতের উত্তরাধিকারে।

শোন তোরে বলি :
যে-ত্রিবলী
তোর জন্ম-সিংহদ্বারে প্রহরীপ্রতিম
আজো তা লাবণ্যময়, করুণ, মধুর।
যে-বন্ধুর
শরীর লজ্জিত, আজো, আপনার আকর্ষণ জেনে,
একদিন তার স্বয়ংবরে
স্বয়ং মহেন্দ্র, যম, বৈশ্বানরে
ক্ষুণ্ণ ক'রে যে-মর যৌবন
হয়েছিলো জয়ী,
তার দন্তে শ্বেত কেশ আজ ব্যঙ্গ করে,
কালাঙ্কিত কপোলে ললাটে
দেবতারই বিপরীত প্রতিপত্তি রটে।

তবু জৈব জাদু ব্যর্থ নয়।
যে-প্রণয়
বিবসন, বিশুদ্ধ, জান্তব
মৃত্যু নেই তার।
আছে শুধু রূপান্তর, আয়ুর সর্পিল সোপানে-সোপানে
আছে নবজীবনের অঙ্গীকার।
যে-মুহূর্তে বাসনাবিহ্বল নীবী
খ'সে পড়ে, দেখা দেয় কালের প্রলয়-জলে
সর্বস্ব তিমির-তলে অলজ্জ বদ্বীপ,
অমনি থমকে কাল, অদৃষ্টের করাল কুহেলি

দীর্ণ ক'রে আদিম পুরুষ
লভে সপ্তদশদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীরে ;
নির্ভয়ে উতরে
স্বগৃহে, স্বরাজ্যে, শান্তির কঠিন তীরে
পুনর্জিত স্বর্গের দুয়ারে।
শিহরে, শিহরে
আজিও সে-কথা মনে হ'লে
এ-জীর্ণ তনুর অন্তরালে
অকাল কঙ্কাল—
যে-মুহূর্তে তরঙ্গিত সময়-সলিলে
দ্বিখণ্ডিত হ'লো ক্রূর অদৃষ্টের শিলা,
ম্লান হ'লো হুতাশন, ব্যর্থ হ'লো যমদণ্ড, ইন্দ্রের কুলিশ—
বিশ্বাস না হয় যদি, জননীরে শুধায়ে দেখিস।

কিন্তু শেষ শিক্ষা আছে বাকি।
ক্লান্ত আজ স্বেচ্ছাচারী অজ্ঞান বৈশাখী
একদিন উন্মাদ নৃত্যের তালে-তালে
পঞ্জরে যে মুঞ্জরেছে, সংকীর্ণ কঙ্কালে
করেছে সকাম।
স্তব্ধ আজ রলরোল ; বিলোল আকাশগঙ্গা
ঝরে না ঝরে না আর নীহারিকা-স্বপ্নাকুল উৎসুক নিশীথে,
অন্ধকারে, চন্দ্রালোকে, সন্ধ্যায় নিভৃতে
শরীরসীমান্ত বার-বার
বিচূর্ণ হয় না আর
উপপ্লবী বাসনার বর্বর জোয়ারে।
জরার জটিল রেখা শরীরেরে
কঠিন পাথরে ঘেরে ;
এ-দুর্গম দুর্গে বন্দী, অনাক্রমণীয়,
নিশ্চিন্ত আমার সত্তা ; অনর্গল, অক্লান্ত ইন্দ্রিয়
এতদিনে রুদ্ধ হ'লো। অপরাহ্ণ ছিন্ন-অঙ্গ মেঘে

সবুজ হলুদ নীলে পশ্চিমে অন্তিম
বাসর সাজালো।
সূর্যাস্তের জাদুকর আলোর আয়না
হাতে নিয়ে সন্ধ্যা নামে : অন্ধকারে জলে শুধু ছায়ার, স্মৃতির
অফুরন্ত ভিড়। এ-শরীর অবলুপ্ত জান্তব যৌবনে
হঠাৎ হারায়। কল্পনা বাড়ায় প্রেত-হাত,
দীর্ঘ ছায়া পার হ'য়ে অতীতেরে আনে সে ছিনায়ে।
সেখানে এখন
বিনষ্ট সংকল্প পূর্ণ, সার্থক ধিক্কৃত অনটন,
স্বার্থ-কেন্দ্র-চ্যুত বিশ্ব ফিরেছে আদিম মহিমায়।
জীবনের সমাপ্তিসীমায়
শেষ শিক্ষা এ-ই ছিলো বাকি।

শিখেছি বৃদ্ধের বিদ্যা। হাস্যকর, নশ্বর, একাকী,
ব'সে-ব'সে চেয়ে দেখি দাম্ভিক যুবক-দল চলে কলোচ্ছ্বাসে,
আর দেখি তোরে, ওরে
দেব-বিজয়িনী যৌবনগর্বিণী কন্যা, সে কন্যা আমার।
সহস্র নলের ছল ব্যর্থ হবে, ফিরে যাবে
ইন্দ্র, যম, বৈশ্বানর, দুঃখের কুটিল
অরণ্য পুষ্পিত হবে চৈত্ররথ বনে
তোর যৌবনেরে ঘিরে। সেদিন আমার
কাল-কলঙ্কিত, তুচ্ছ শরীরে তাকায়ে
এ-কথা বিশ্বাস তোর কখনো হবে না—
সহস্র বসন্ত ছিলো আমার যৌবন,
সহস্র চৈত্রের রাত্রি কাটায়েছি মুহূর্তের পরিপূর্ণতায়।
কবে এলো হংসদূত, ক'য়ে গেলো প্রিয়তম নাম,
স্বতঃশ্লথ নীবীবন্ধে আনন্দের ঢেউ তুলে—
সেদিন কখনো ভুলে
ওরে স্বয়ংবরা, তোর এ-কথা হবে না মনে—
যে-নারীর দেহ এই পৃথিবীতে তোর সিংহদ্বার

এ-প্রণয় তারই উত্তরাধিকার,
এ-বিশ্ববিজয় তারই কাহিনীর পুনরভিনয়।

তাই তো বিনয়
হৃতশক্তি বৃদ্ধের সম্বল।
অপেক্ষার যে-কলাকৌশল
ধৈর্যের যে-চতুরালি ধনী যৌবনের
ব্যঙ্গের বিষয়, দরিদ্র বার্ধক্য তাই দিয়ে
জীবনের ব্যবসার প্রাক্-প্রালয়িক
ভবিষ্যৎহীন দিনগুলি
সযত্নে সাজায়। অবাস্তব, তুচ্ছ, অনর্থক,
পরিত্যক্ত, বিবর্ণ পুতুল—
ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, আর
কয়েকটি হাড়—
এ-ই আমি, এ-ই আমি। তাই বলি
বলি বার-বার,
'অপেক্ষা শেখাও,
শেখাও ধৈর্যের নীরবতা,
এ-বিশ্বে ফিরায়ে দাও আদিম মহিমা।
আমার ইচ্ছার
চক্র থেকে মুক্ত করো সূর্য, চন্দ্র, সমুদ্র, পাহাড,
তারার জলন্ত নৃত্য, পৃথিবীতে সবুজের খেলা,
আকাশের সোনালি-নীলের মেলা,
মুক্ত করো জন্ম, মৃত্যু, আমার প্রেমেরে
প্রেমেরেও মুক্তি দাও ইচ্ছার শৃঙ্খল থেকে—'

আজ তোরে দেখে,
হে নবযৌবনা কন্যা, রে কন্যা আমাব,
আমার প্রেমের মুক্তি। দেখি চেয়ে-চেয়ে—
আজিও করাল কাল ঘুমন্ত যেথানে—
পূর্ণিমা-মুখশ্রী তোব, পার্থিব অমরা।

তার জরা
সূর্যের মৃত্যুর মতো
নিশ্চিত, অথচ
অসম্ভব মনে হয় ; মনে হয়
কাল, তাও তুচ্ছ যেন, এ-বিশ্বের স্থবির ঘটনা,
রূপান্তরহীন।
লক্ষ রাত্রি, লক্ষ দিন
কেটে যায়—না কি আসে ফিরে-ফিরে
মৃত্তিকার মূর্তি দিতে চিরন্তনী দময়ন্তীরে ?

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা,
শেষ তব শীর্ণ ছায়া শুষে নিলো আজ
শুভ্র সভ্যতার সূর্য।
করো, জয়ধ্বনি করো,
ছিন্ন হ'লো ঘন অন্ধকার
মেঘবর্ণ মেখলা লুণ্ঠিত—
ঐ এলো প্রেমিক বণিক-বীর
তব নগ্ন কৌমার্যেরে ত্বরিতে করিতে
সভ্যতাসন্তানবতী
দীর্ণ তব হৃৎপিণ্ডের রক্তের যৌতুকে।

হে আফ্রিকা, হও গর্ভবতী।
আনো আনো বাণিজ্যের জারজেরে
দ্রুত তব অঙ্কতলে।
পূর্ণ হোক কাল।
স্থূলোদর লোলজিহ্ব লোভ
রক্তস্ফীত বাণিজ্যের বীজ
হোক পূর্ণ হোক।

করো,

বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাত-পঙ্গু, নপুংসক বিকৃত জাতক,

তার জয়ধ্বনি করো।

উন্মত্ত কামার্ত ক্লীব, আত্মরক্ষা আত্মহত্যা তার।

হে আফ্রিকা,

অবসন্ন বণিকবৃত্তির নিহিত মৃত্যুর 'পরে

বিদ্যুৎ-চমকে

কালের কুটিল গতি গর্ভবতী করিবে কঙ্কালে।

হে আফ্রিকা, হে গণিকা-মহাদেশ,

একদিন তব দীর্ণ বিষুবরেখায়

শতাব্দীর পুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধকার

উদ্দীপিত হবে তীব্র প্রসব-ব্যথায়।

করো,

মৃত্যুরে মন্থন করি' নবজন্ম কাঁপে থরোথরো,

জয়ধ্বনি করো।

নির্মম যৌবন

যৌবন করে না ক্ষমা।

প্রতি অঙ্গে অঙ্গীকারে করে মনোরমা

বিশ্বের নারীরে। অপরূপ উপহারে কখন সাজায়

বোঝাও না যায়।

তার সে-পসরা

কিছুতেই যায় না গোপন করা।

বারণ শোনে না,

বিচার করে না কিছু, দূর ক'রে দেয় সব ভেদ,

বিশ্বজয়ী এমন দুর্দান্ত সেনা

এমন নির্মম সাম্যবাদী

আর তো দেখিনে।

আসে পথ চিনে
প্রাসাদে কুটিরে মাঠে পল্লীর নিভৃতে
শহরের কুৎসিত বস্তিতে।
নিশ্চিত সে মৃত্যুর মতোই,
রক্ষা নেই তার হাতে, অমৃতে অথই
হবেই যে-কোনো নারী-দেহ
কোনো-একদিন। দয়া নেই, ক্ষমা নেই,
জীবনের কিছুকাল—নারী যে, সে রানীও হবেই।
এমনকি পথে-পথে বেড়ায় যে ভিখারিনী মেয়ে
আঁস্তাকুড়ে খাদ্যকণা খেয়ে,
অতি জীর্ণ জঘন্য মলিন যার বাস
তারেও ছাড়ে না
যৌবনের ক্ষমাহীন সেনা।
তারেও সুন্দর করে, তারেও সাজায়,
লজ্জা দেয়, ভঙ্গি দেয়, দেহ ভ'রে তোলে
লাবণ্য-হিল্লোলে।
বোঝে না যে এতই সে নিরুপায়
দেহ যত শুষ্ক হবে, যত মৃতপ্রায়
তত তার লাভ।
এই আবির্ভাবে
শুধু তার বিপদ বাড়াবে।
উচ্ছিষ্টের কণা
কুড়িয়ে পাওয়ায় যার জীবনসাধনা
তারে কি মানায়
যৌবনের উন্মীলন কানায়-কানায়।
চায়নি সে, চায়নি সে, নিতান্তই ক্ষুন্নিবৃত্তি যার
সব চেয়ে বড়ো কাম্য, এ যে তার অসহ্য জঞ্জাল,
উপরন্তু বিড়ম্বনা।
দেহে যার আবরণ নেই, শয্যা যার পথের ঘৃণিত আবর্জনা
তার 'পরে এ কী অত্যাচার!

পশুতে পাখিতে গাছে ঘাসে
আনন্দিত পূর্ণতায় যৌবন বিকাশে,
হিরণ্ময় পাত্রে ঝরে সুবর্ণ মদিরা।
ওরাও যে সুন্দর আধার
তাই তো ওদের আছে জন্ম-অধিকার
যৌবনের জাদুকর রূপান্তরে।
বিশ্ব ভ'রে চেয়ে দেখি সুন্দরের লীলা
এর মধ্যে ক্লেদাক্ত মাটির ভাঁড়
বিশ্বের কুৎসিত ক্ষত ঐ ভিখারিনী।
যার কিছু নেই, তার যৌবনেও নেই অধিকার
অতি সত্য এই কথা,
তবু প্রতিদিন এর ঘটায় অন্যথা
নির্মম নিয়তি।
ভিখারিনী, সেও যে যুবতী
এ বেসুর, এ নিষ্ঠুর অসংগতি
কেমনে সহিছে বিশ্বপ্রকৃতির বীণা
আমি তো বুঝি না।

ম্যাল-এ

১

'আপনারা কবে? আমরা এসেছি সাতাশে।
ওকভিলে আছি। আসবেন একদিন।'—
শাড়ির বাঁধনে শোভে শরীরের ইশারা,
ঠোঁটের গালেব রঙের চমকে কী সাড়া!
কী করুণ, আহা, অতরুণ তনু সাজানো!
সবি বুঝলুম। ইচ্ছে হ'লে যে বাংলাও পারে বলতে
তাও বুঝলুম। মহৎ যত্নে অ্যাকসেণ্টগুলো মাজানো
ব্যর্থ হবে কি তাই ব'লে, বলো!

নিখুঁত বাংলা ফোটে ফিরিঙ্গি রঙ্গে,
ইংরেজি সুরে তির্যক গতিভঙ্গে।
আমরা চমকে থমকে দাঁড়াই, হয়তো বা কারো জুতোই মাড়াই,
বাংলা শুনেই সার্থক শ্রম চৌরাস্তায় সন্ধেবেলায় হাঁটলে।
ভাবি শুধু এই, অমনি সুরেই বেরোবে কি বুলি হঠাৎ চিমটি কাটলে?

২

আজকে না-হয় ম্যাঁলেই চলো।
ভারি সুন্দর বিকেল—না?
মিমির জন্যে কী-খেলনা
কিনবে? দোকানে গেলেই হ'লো।
তোমার নতুন কী চাই, বলো?
কিচ্ছু চাইনে? এমন মিথ্যে
কী ক'রে বললে? কপট অঙ্ক
রটায় আমার কত কলঙ্ক,
তুমিও কি তাই শুনে ঘাবড়ালে?
গণিকা গণিত লক্ষপতিকে
খোশামোদ করে, পেয়ে বেগতিকে
আমাকে নিত্য করে নাজেহাল,
কখনো একটু পিঠ চাপড়ালে
খুশি হয় মন, পানি পায় হাল—
এ ছাড়া আমার, বিশ্বাস করো, আর কোনো দোষ নেই চরিত্রে।

৩

আজো কি মানবে গণিতের কড়া জুলুম
জাদুকর রোদে এমন বিরল বিকেলবেলায়?
হীন অঙ্কের মেনে দাসত্ব
হারাবো কি শেষে জীবনস্বত্ব?
বেঁচে থাকবার এই কি শর্ত? তুমিই বলো!
সিঁদুরে শাড়িটা প'রে নাও তাড়াতাড়ি। ম্যালেই চলো।

মলিন হিংসের ঋণের কুঁজও আজকে মিলায়
তুষার-তাঁবুর দড়ি-ছেঁড়া তিব্বতি এ-হাওয়ায়,
ভোলো প্রতিদিন-পুঞ্জিত ঋণ, ভোলো বেমালুম
জোড়াতালি-দেয়া ছেঁড়াখোঁড়া দিন। কপাল ভালো,
খালি প'ড়ে আছে আস্ত বেঞ্চি।
ভোলো, ভয় ভোলো।
যে-ভয় জীবনে ফণিমনসার বন,
যে-ভয়ে নিত্য মেনে চলি মহাজন,
যে-ভয়ে কখনো গান্ধির কভু অরবিন্দের চরণ-শরণ,
ত্যাগের কন্থা যোগের পন্থা মানস-বরণ,
দিশি সিনেমায় ঋষি-মহিমায় ইচ্ছাপূরণ,
সত্য, শিব ও সুন্দরে ঢাকি জীর্ণ জীবন, জীবনে-মরণ,
যে-ভয়ে নিত্য ব্যর্থ কর্ম, মিথ্যাচরণ,
কেননা জীবন কেবলি জীবনধারণ,
জীবিকাই, হায়, জীবন। আজ
সে-ভয় ভোলো।
ছাখো চেয়ে ছাখো পায়ের তলায় মেঘের মেলায় আলো মিলায়,
উত্তর-জোড়া তুষার-চূড়ায় খেয়ালি বিকেল আগুন ছড়ায়,
ক্ষণিক রঙের বণিক সূর্য নিবলো এবার। হারালো তুষার-মোড়া উত্তর,
হারালো আকাশ হঠাৎ কুয়াশা লেগে, বারুদগন্ধী মেঘে।
ছায়ামুড়ি দিয়ে ছায়ামূর্তির মতো
জটিল জনতা প্রগল্‌ভ গতিশীল,
স্বৈরী মেঘের পূর্ণ স্বরাজ
দেখেই কি ওরা এমন দরাজ,
স্বেচ্ছাচারের উচ্চচূড়ার জঙ্গমতা
বঙ্গমাতার সন্তানেরাও আজ কি পেলো?
মেঘ-মুড়ি দিয়ে জললো আলো,
ল্যামপোস্টগুলো পরেছে আলোর গোল টুপি,
ঠিক খৃস্টান দেবদূত!
এসো কাছে এসো, শোনো কথা চুপি-চুপি,

এ কি নয় অদ্ভুত
তুমি আর আমি ব'সে আছি এই কুয়াশা-মোড়া
চৌরাস্তায়, মেঘের মধ্যে,
সব বেয়াদব চোখ মুছে গেছে এ-ঘন মেঘে,
এবার বলো!
এখনি হয়তো হঠাৎ হাওয়ার আঘাত লেগে
মেঘ কেটে যাবে ; কেটে যাবে এই গণিত-অতীত বিরল ক্ষণ।
এখনি বলো। ঐ তো এলো
নিষ্ঠুর হাওয়া মেঘের ঝাঁটা, কুয়াশা-কাটা।
আকাশ ফেটে কি ফুটলো তারা ? লাগলো হাওয়ার তীব্র তাড়া ?
এবার তাহ'লে ফিরেই চলো। আজো কি হ'লো
তোমার আমার অনেকদিনের অঙ্গীকারের উদ্‌যাপন ?

সাগর-দোলা

ছোটো ঘরখানি মনে কি পড়ে,
সুরঙ্গমা ?
মনে কি পড়ে ? মনে কি পড়ে ?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারাদিনরাত হাওয়ার ঝড়ে
সাগর-দোলা,
সারাদিনরাত ঢেউয়ের তোড়ে
নাগর-দোলা,
আকাশ-মাতাল জানালা খোলা
দিগন্ত থেকে দিগন্তরে,
দিগন্ত-জোড়া সাগর ভ'রে
ঢেউয়ের দোলা।
সারাদিনরাত হাজার ঢেউয়ের উচ্চস্বরে
অন্ধ অবোধ হাওয়ার ঝড়ে

কী যে লুটোপুটি ছুটোছুটি ঐ ছোট্ট ঘরে
মনে কি পড়ে ? মনে কি পড়ে ?
কত কালো রাতে করাতের মতো চিরে
ভাঙাচোরা চাঁদ এসেছে ফিরে
তীক্ষ্ণ তারার নিবিড় ভিড়ে
ভাঙন এনে,
কত কৃশ রাতে চুপে-চুপে চাঁদ এসেছে ফিরে
সাগরের বুকে জোয়ার হেনে
তোমারে আমারে অন্ধ অতল জোয়ারে টেনে
মনে কি পড়ে ?
কত উদ্ধত সূর্যের বাণে তুমি আর আমি গিয়েছি ছিঁড়ে
কত যে দিনেরে চুম্বন টেনে দিয়েছি মুছে
কত যে আলোর শিশুরে মেরেছি হেসে
সেই ছোটো ঘরে মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা,
মনে কি পড়ে ?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারাদিনরাত ঢেউয়ের দোলা,
সমুদ্র-জোড়া দিগন্ত থেকে দিগন্তরে
সারাদিনরাত জানালা খোলা।
দস্যু হাওয়ার উচ্চস্বরে
তপ্ত ঢেউয়ের মত্ত জোয়ার-জ্বরে
কী যে তোলপাড় দাপাদাপি ঐ ছোট্ট ঘরে মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা ?
মনে কি পড়ে
তোমার আমার রক্তে ঢেউয়ের দোলা,
মনে কি পড়ে
তোমার আমার রক্তে হাজার ঝড়ে
কত সমুদ্র তপ্ত জোয়ার-জ্বরে
মনে কি পড়ে ?

কত মৃত চাঁদে এনেছি ফিরায়ে রাত্রিশেষে
কত বর্বর শিশু-সূর্যেরে মেরেছি হেসে
ঘন-চুম্বন-বন্যায় কোন অন্ধ অতলে গিয়েছি ভেসে
মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা,
মনে কি পড়ে ?

ইলিশ

আকাশে আষাঢ় এলো , বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল ।
মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেলসারি
বৃষ্টিতে ধূমল , পদ্মাপ্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ি
বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপট-সম অচঞ্চল ।

মধ্যরাত্রি , মেঘ-ঘন অন্ধকার , দুরন্ত উচ্ছল
আবর্তে কুটিল নদী , তীর-তীব্র বেগে দেয় পাড়ি
ছোটো নৌকাগুলি , প্রাণপণে ফেলে জাল, টানে দড়ি
অর্ধ নগ্ন যারা, তারা খাদ্যহীন, খাদ্যের সম্বল ।

রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে
জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি-রাশি ইলিশের শব,
নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড় ।
তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে-ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ , কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার
সরস শর্ষের ঝাঁজে ।   এলো বর্ষা, ইলিশ-উৎসব ।

জোনাকি

এ কী
জোনাকি !
তুই কখন
এলি বল তো !
একলা
এই বাদলায়
কেন কলকা-
তায় এলি তুই ?
(এই সারারাতজ্বলা চিরদীপমালা দেয়ালি-আলোয় !)
তোর সঙ্গী
সব পাড়াগাঁর
পথে সারা রাত
ঘন অন্ধ-
কারে জ্বলছে।
কোন সরকার দর-
কারে তার
এই শহরে
তোকে শফরে
আজ পাঠালো !
(এই চাঁদ-তারা-ঝরা ছায়া-ছেঁড়া চির-দেয়ালি-আলোয় !)
এ যে কলকা-
তার ফুটপাত,
নেই ফাঁকা মাঠ
নেই ঝোপঝাড়
নেই জঙ্গল,
তুই ফিরে যা
তোর পাড়াগাঁর
পচা পুকুরের

পাড়ে থমথমে
কালো রাত্তিরে
কর ঝলমল—
(জ্বল, চঞ্চল তারা তারা-ভরা কালো আকাশ-তলে।)
এই কলকা-
তায় রাত নেই,
নেই চুপচাপ,
তারা তাড়ানোয়
ঘুম কাড়ানোয়
ভরা সারা রাত।
তুই এ-ঘরে
কোন বিঘোরে
এলি দেয়ালে
ছাদে জানলায়
খাটে আলনায়
ঘুরে মরতে।
(এই আশবাব-ঠাশা হাঁশফাঁশ-করা গুমোট ঘরে!)
আমি একলা
এই বাদলায়
শুয়ে দেখছি
তোর ঝিকমিক
জ্বলে মশারির
কোণে চিকচিক,
ঘুম আসে না।
ভাবি, ঘুটঘুট
ঘোর রাত্তিরে
তোর সঙ্গীরা
তোকে ডাকছে
তুই ফিরে যা—
(তোরা মাঠ-ভ'রে-ফোটা সবুজ তারার দেয়ালি জ্বালা।)

যা ফিরে যা
তোর পাড়াগাঁয়—
না, না, যাসনে
তুই এখনই ;
আরো একটু
থাক, চক্ষু
ভ'রে দেখে নিই—
(এই দেয়ালি-আলোয় চঞ্চল কলকাতার রাতে !)
তবু এটুকুই
বলি ভাগ্য
আজ এলি তুই
এই রাত্রে—
চোখে ঘুম নেই।
সারা শহরে
আমি একলা
শুধু দেখলুম
তোর পাখনার
আলো ঝিলমিল
যেন ছোট্ট
তারা ফুটলো,
যেন স্বপ্নে
দিলি ক্ষণিকের
সুখ- সঙ্গ
তুই জোনাকি !

যামিনী রায়-কে

আমরা সবাই প্রতিভাবে ক'রে পণ্য,
ভাবালু আত্মকরুণায় আছি মগ্ন,
আমাদের পাপে নিজের জীবনে জীর্ণ
করলে, যামিনী রায়।
জীবনের রসে শিল্পেরে দিলে প্রাণ,
জ্বালালে জীবন শিল্পের শিখা থেকে।
তুমি জয়ী হ'লে আপনার প্রাণ নিঃশেষে ক'রে দান,
আমরা পতিত খানিকটা হাতে রেখে।

পাপের প্রাচীর দিকে-দিকে হবে ভগ্ন,
আবার আসবে শিল্পীর শুভলগ্ন--
পুঁথিতে রুদ্ধ ক্ষুব্ধ প্রাণের স্বপ্ন রচনা ক'রে
আমাদের দিন যায় :
পুঁথি ফেলে তুমি তাকালে আপন গোপন মর্মতলে,
ফিরে গেলে তুমি মাটিতে, আকাশে, জলে।
স্বপ্ন-লালসে অলস আমরা তোমার পুণ্যবলে
ধন্য, যামিনী রায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

তোমারে স্মরণ করি আজ এই দারুণ দুর্দিনে
হে বন্ধু, হে প্রিয়তম। সভ্যতার শ্মশান-শয্যায়
সংক্রমিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মজ্জায়,
প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা। রক্তপায়ী উদ্ধত সঙ্গিনে
সুন্দরেরে বিদ্ধ ক'রে, মৃত্যুবহ পুষ্পকে উড্ডীন
বর্বর রাক্ষস হাঁকে, 'আমি শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বড়ো।'

দেশে-দেশে সমুদ্রের তীরে-তীরে কাঁপে থরোথরো
উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ।

প্রাণ রুদ্ধ, প্রাণ স্তব্ধ। ভারতের স্নিগ্ধ উপকূলে
লুব্ধতার লালা ঝরে। এত দুঃখ, এ-দুঃসহ ঘৃণা—
এ-নরক সহিতে কি পারিতাম, হে বন্ধু, যদি না
লিপ্ত হ'তো রক্তে মোর, বিদ্ধ হ'তো গূঢ় মর্মমূলে
তোমার অক্ষয় মন্ত্র। অন্তরে লভেছি তব বাণী
তাই তো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে, জানি।

মধ্যতিরিশ

মধ্যতিরিশের ইস্টেশনে গাড়ি এসে থামলো।
বড়ো জংশন, লাইন বদল হবে, গাড়ি দাঁড়াবে কিছুক্ষণ।
কালো কাপড় পরা প্রহরী এসে বললে,
'যৌবনরাজ্যের সীমান্ত আমরা পেরিয়ে এলাম,
এবার যাত্রা হবে বার্ধক্যভূমির দিকে।'
কবে বেরিয়েছিলাম বাড়ি ছেড়ে মনে পড়ে না,
কবে বাড়ি ফিরবো তাও জানিনে।
স্বপ্নের মতো মনে পড়ে শ্যামল সমতল শৈশবদেশ,
নীলে সোনায় মেলামেশা, জাফরানি-বেগনিতে গলাগলি।
কৈশোরদেশটি ছোটো, ঈষৎ-রুক্ষ, বন্ধুর,
অথচ লাবণ্যের আভাস দিচ্ছে থেকে-থেকে,
আহা, যৌবন-সীমান্তের লাবণ্য।
দেখতে-দেখতে যৌবনরাজ্যে এসে পড়লাম,
যেদিকে তাকাই, চোখ আর ফেরে না।
আকাশে-বাতাসে অনর্গল অপরিমিত উচ্ছ্বাস।
দিন রাত্রি দুই বোন, আবার সপত্নী,
কেননা দু-জনেই আমার প্রেয়সী।

ওরা দু-জনেই আমাকে ভালোবাসে, আবার ভালোবাসে পরস্পরকে,
তাই তো সন্ধ্যা আর উষা এত সুন্দর।
যৌবনরাজ্যের সবই যে ভালো তা নয়।
অনেকগুলো সুরঙ্গ পার হ'তে হ'লো,
কোনোটা লম্বা, কোনোটা আঁকাবাঁকা, কোনোটা দুর্গন্ধে আবিল।
সে-অন্ধকারে কখনো ভয় পেয়েছি, কখনো রুদ্ধ হ'য়ে এসেছে নিশ্বাস,
তারপরেই খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এসে
মনে হয়েছে নবজন্ম হ'লো।
এইখানটায় গাড়ির গতি সবচেয়ে দ্রুত,
আহা, কী আনন্দ সেই গতির।
দিগন্তের পর দিগন্ত কেবলই পার হচ্ছি,
সুখদুঃখের হাওয়া বইছে, ভালোমন্দর ধুলো উঠছে,
কিন্তু ও-সব কিছু নয়, চলাটাই সব।
গাড়ির বেগ ক্রমে মন্থর হ'লো,
মনে পড়তে লাগলো, কত বিচিত্র দেশ পিছনে ফেলে এসেছি,
কত জন্ম, কত জন্মান্তর অতিক্রম করলাম।
এখনো কি শেষ হবে না? আরো কি চলতে হবে?
ভাবতে-ভাবতে গাড়ি এসে দাঁড়ালো মধ্যতিরিশে।

প্রহরী বললে, 'এখন থেকে কঠিন পথ সামনে, গাড়ি উঠবে পাহাড়ে,
ধীরে এগোতে হবে, এঁকে-বেঁকে,
মালের বোঝা কমানো চাই।'
শুনে ভয় হ'লো।
কামরাটা গুছিয়ে নিয়েছিলাম মনের মতো ক'রে,
ঠিক মনের মতো নয়, স্বল্প পরিসরে কতটুকুই বা ধরানো যায়।
তবু কিছু ছিলো আরামের টুকিটাকি, অনেক দিনের ছোটোখাটো সঞ্চয়,
ফেলে দিতে বলবে না তো?
প্রহরী কামরায় ঢুকে দেখতে লাগলো চারদিকে তাকিয়ে।
বেঞ্চির উপর শুয়ে ছিলো আমার পোষা কুকুরটা,

হঠাৎ উঠে গিয়ে তার পা শুঁকতে লাগলো।
প্রহরী বললে, 'এই কুকুর কেন?'
আমি বললুম, 'যাত্রার প্রথম থেকেই ও আমার সঙ্গী।
উচ্চাশা ওর নাম,
একেবারে সাচ্চা জাতের কুকুর।'
প্রহরী বললে গম্ভীর স্বরে, 'ওকে আর রাখা চলবে না,
নামিয়ে দিতে হবে এইখানে।'
আর-কিছু না-ব'লে হিড়হিড় ক'রে ওকে নামিয়ে নিয়ে চ'লে গেলো।
হায়-হায় ক'রে উঠলো আমার মন।
কত যত্নে লালন করেছি ওকে, কত ভালোবেসেছি,
প্রতিদিন খাইয়েছি নিজের হাতে,
বিরাট সেই ভোজ।
ওর ক্ষুধা প্রচণ্ড, সব সময় যথেষ্ট খাবার জোটেনি,
তখন আমাকেই ছিঁড়ে খেতে চেয়েছে,
শান্ত করেছি চাবুক মেরে।
আকণ্ঠ খাওয়া যখন দিতে পেরেছি,
তখন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে-শুয়ে আমার পা চেটে দিয়েছে,
সেটা মন্দ লাগেনি।
এই দীর্ঘ পথে ওকে নিয়ে কষ্ট পেয়েছি অনেক,
ওর ক্ষুধার আন্দাজ খাদ্য কোথায় জুটবে, সে এক ভাবনা।
কখনো মনে হয়েছে ওকে সঙ্গে এনে ভালো করিনি,
ও যে প্রভুর উপরেই প্রভুত্ব করে।
তবু কেমন মায়া প'ড়ে গিয়েছিলো ওর 'পরে,
গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করেছি,
ফেলে দিতে পারিনি।
আজ যখন ওকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো,
কষ্ট তো হ'লোই, কিন্তু সেই সঙ্গে শান্তিও যেন পেলুম।
দেহ-মন হালকা, কামরায় হাত-পা ছড়াবার জায়গা হ'লো,
ওর খাবার জোগানোর ভাবনা তো আর ভাবতে হবে না,
এবারে আরাম করা যাক।

কামরাটা গুছোতে লাগলুম নতুন ক'রে, অনেক সঞ্চয় মনে হ'লো আবর্জনা, ফেলে দিলুম বাইরে।

ঢং ঢং বাজলো ঘণ্টা,
গাড়ি এখনি ছাড়বে।
প্রহরী আবার এসে বললে, 'প্রস্তুত হ'য়ে নাও।
বার্ধক্যভূমি চোখ ভোলায় না,
সে রিক্ত, সে শুভ্র, সে অকিঞ্চন।
তার গৌরব গিরিচূড়ার স্তব্ধতায়
ঠাণ্ডা আকাশের কঠিন নির্লিপ্ত নীলিমায় তার মহিমা।
অনেক উঁচুতে উঠবে, হয়তো মাথা ঘুরবে, হয়তো বমি হবে,
কিছুই ভালো লাগবে না।
তোমার শক্তি একে-একে খ'সে পড়বে, তোমার ইচ্ছা একে-একে ম'রে আসবে।
যা চেয়ে পেয়েছো তা ভুলে যাবে
যা চেয়ে পাওনি তা আর চাইবে না।'
তাড়াতাড়ি বললুম: 'কত জন্ম কাটলো, কত দিগন্ত কাছে এসে স'রে গেলো দূরে,
এখন মনে হচ্ছে ভালো ক'রে কিছুই দেখিনি,
সবই অজানা।
ঐ উঁচুতে উঠে তার সমস্তটা দেখতে পাবো তো?
চোখে পড়বে তো তার স্বরূপ?'
প্রহরী বললে, 'জিজ্ঞাসা করো নিজের মনকে,
কেননা চোখ কিছুই ছাখে না, মন সব ছাখে।'
ব্যাকুলস্বরে বললুম, 'যদি দেখতে না পাই তাহ'লে কী হবে?
এই ভ্রমণ কি ব্যর্থ হ'লো, বাড়ি ফিরে কিছুই কি বলতে পারবো না?'
উত্তর হলো: 'বাড়ি ফিরে গিয়ে তোমার মা-কে পাবে,
তিনি কিছুই জিজ্ঞাসা করেন না,
শুধু কোলে টেনে নেন।'
রুদ্ধস্বরে বললুম, 'এর পরে আরো কি পথ আছে? কবে ফিরবো?'
উত্তর এলো: 'এর পরেই বাড়ি।'
গাড়ি ছেড়ে দিলো।

খণ্ড দৃষ্টি

'তিন দিন আগে জল খেয়েছিলুম,
গেলাশটা মেঘলা হ'য়ে
আজো প'ড়ে আছে টেবিলে।
ছাইদানগুলো আকণ্ঠ ঠাশা,
উপচে পড়ছে আমার লেখার কাগজে
দেশলাইয়ের কাঠি, সিগারেটের টুকরো।
নাবার ঘরে জল নেই,
খেতে বসলেই বিবাগী হ'তে ইচ্ছে করে।
মেঝেতে ধুলো, বিছানা অগোছালো
ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি কখনোই হয় না।
মনে হচ্ছে এ যেন আমাদের বাড়িই নয়,
কোথাও এসে উঠেছি দু-দিনের জন্য।
বোমাই বলো, ট্র্যাম-পোড়ানোই বলো,
আর বাংলা সাহিত্যের অধঃপতনই বলো—
কোনো বিপদই এমন বিপদ নয়
পুরোনো চাকরের দেশে যাওয়ার মতো।'

এই পর্যন্ত শুনে মক্ষিরানি বললেন,
'থামো তো তুমি।
পান থেকে চুন খসলেই অস্থির হওয়া তোমার স্বভাব,
এদিকে আমি যে সারাদিন চরকির মতো ঘুরছি—'

'ঐখেনেই তো আমার আরো আপত্তি।
শরীর তোমার ভালো না, ডাক্তার বলেছে শুয়ে থাকতে,
অথচ আজ সকাল থেকে দেখছি রান্নাঘরেই—'

'ওঃ, নিজের স্ত্রীর উপর খুব তো দরদ!
আর কালীচরণ বুঝি তোমার সেবার জন্যই জন্মেছে।'
ব'লে আঁচল ঘুরিয়ে চ'লে গেলো বোধ করি রান্নাঘরেই।

ব'সে-ব'সে ভাবতে লাগলাম।
আমি কোনো কাজেই লাগি না, পারি না পান সাজতে, কুটনো কুটতে, পেরেক
ঠুকতে,
যদি জাহাজডুবি হ'য়ে প্রাণে বেঁচে কোনো নির্জন দ্বীপে গিয়ে উঠি
তাহ'লে একদিনও বাঁচতে পারবো না,
হয়তো বাঁচবো আবার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েই।
যদি জন্মাতেম আরব্যোপন্যাসের যুগে
যখন ছোরা ছিলো খেলা, আগুন ছিলো আমোদ,
ফুর্তি ছিলো রক্তের রঙে লাল,
মানুষের প্রাণ বিকিয়ে যেতো চোখের কটাক্ষে,
তাহ'লে কী দশা হতো জানি না, ভাবতেও ভয় করে।
আছি বিশ শতকের শহরে, কলকব্জার আশ্রয়ে,
ভাগ্যগুণে উচ্চশ্রেণীতেও জন্মেছি,
আমার শরীরের সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা সবই অন্যে ক'রে দেয়।
তারা অসংখ্য, তারা অনামী, তাদের দেখা যায় তবু যায় না,
তারা আছে ব'লে ট্র্যাম চলে, জল পড়ে কলে,
আলো জ্বলে বোতাম টিপলে।
আমাদের অন্নবস্ত্রের ভার তাদেরই উপর।
তারা আছে, তারা থাকবে, এটা ধ'রেই নিই,
সভ্যতা তো এই ব্যবস্থারই নাম।
তাদের কথা কখনো ভাবি না,
ভাবতে হ'লে চমকে উঠি।

শুধু এতেও চলে না,
ঘরে-ঘরে পরিচারক চাই।
এই তো আমাদের কালীচরণ।
বুদ্ধি তার যেটুকু দরকার, তার বেশি নেই।
সে বাজার করে, কয়লা ভাঙে, রাঁধে বাড়ে,
দুপুরবেলায় পুরো ঘুমটুকু না-হ'লেই তার চলে না।

তার হাঁকে-ডাকে পাড়া কাঁপে
অথচ অন্ধকারে বেরোতে তার ভয়।
আদবকায়দা সে বেশি শেখেনি, শিখবেও না,
অমার্জিত তার কথা, ভারি ব্যস্ত স্বভাব।
তবু মোটের উপর ভালোই বলি তাকে,
সকাল থেকে প্রতিটি কাজ তার নখদর্পণে, সংসারটি মসৃণ গতিতে চালিয়ে নেয়,
দিনে-রাতে কোথাও ছন্দপতন হয় না।
এটাও ধ'রে নিই।
তার কাজটাই শুধু দেখি, মানুষটাকে চোখে পড়ে না।
এখন সে দেশে গেছে, ঘোলা জলের স্রোতের মতো থেমে-থেমে চলছে আমাদের দিন,
তাই ভাবতে হচ্ছে তার কথা।
সেটা অস্বস্তিকর।

চোখের সামনে ভেসে উঠলো
আমার পরিত্যক্ত পাঞ্জাবি প'রে হেঁটে চলেছে কালীচরণ,
স্টেশন থেকে ছ মাইলের পথ তার বাড়ি।
পথের দু-ধারে ধানখেত, শর্ষেখেত,
আকাশ নীল, গাছপালা সবুজ।
কেমন তার বাড়ি ভাবতে পারি না,
হয়তো মাটির ঘর, হয়তো বাঁশের বেড়ায় খড়ের ছাউনি,
সেখানে আমাদের কালী নয় সে,
সেখানে সে কারো স্বামী, কারো পিতা, কারো পুত্র।
সেখানে সে বন্ধু, সে ভাই।
তারপর দেখছি তাকে
মাঠে কাটছে ধান
তার খোলা কালো গায়ে রোদ্দুর পড়েছে, হাওয়া লাগছে,
ফসলের সোনায় রোদের সোনায় গলাগলি।
সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে একটু হাসি, একটু সুখ, একটু স্বপ্ন।

তারপর একদিন আমার পোস্টকার্ড যাবে
আবার তাকে পথ ধরতে হবে—উল্টো দিকে।
চলতে-চলতে মনে পড়বে
পাঁচ আনা দামের যে-আশিশানা এবার নিয়ে এসেছিলো
সেটা লক্ষ্মীর তাকে তুলে রাখবে তো ওরা
ছেলেটার নাগালের বাইরে।
আর মনে পড়বে একটি শাঁখা-পরা হাত
ঘোমটার তলায় চোখের ছলছলানি।

বর্ষার দিন

সকাল থেকেই বৃষ্টির পালা শুরু,
আকাশ-হারানো আঁধার-জড়ানো দিন।
আজকেই, যেন শ্রাবণ করেছে পণ,
শোধ ক'রে দেবে বৈশাখী সব ঋণ।
রিমঝিম ঝরে অঝোরে অন্ধ ধারা,
ঘনবর্ষণে আপাত-আত্মহারা
পৃথিবীতে যেন দিন নেই, রাত নেই,
স্তম্ভিত কাল মেঘ-মায়ালোকে লীন।

পথের পাথরে উঠছে জলের ধোঁয়া,
উঁচু গাছগুলি মাথা নিচু ক'রে চুপ,
বস্ত্রগলিত তরলিত এই দিনে
সেই ভালো হয়, সব যদি যায় খোওয়া।
তবু ন-টা বাজে, তবু ছাতা হাতে নিয়ে
ট্র্যামে চ'ড়ে বসি আপিশের অভিসারে,
কেরানিকীর্ণ খাঁচার রন্ধ্র দিয়ে
থেকে-থেকে লাগে সিক্ত কোমল ছোঁওয়া।

লুপ্ত, নিভৃত, অমর্ত্য এ-দিনেও
মস্ত শহর ব্যস্তমুখর কাজে,
মানুষ-মূষিক বন্দী যে-পিঞ্জরে
আজো খোলা আছে গোগ্রাসী তার হাঁ-যে।
তারি অদম্য অনতিক্রম্য টানে
অগণ্য ছাতা পথ ক'রে আছে কালো,
বিত্তশালীও মুক্ত-ইচ্ছা নয়,
কর্মঠ মুখে চলেছে মোটরযানে।

আমি সেই ভিড়ে নিঃশেষে মিশে গিয়ে
চলি একাগ্র নিরুপাধি, নামহীন।
হাড় থেকে কেউ নিংড়ে নিয়েছে মজ্জা,
পায়ে-পায়ে বাজে জীর্ণ জুতোর লজ্জা,
ব্যর্থ জীবন মূর্ত করেছে যেন
দু দিনের দাড়ি, রজকরহিত সজ্জা।
জীবন্‌ ডোবানো বৃষ্টি যখন ঝরে
সময়-হারানো স্বপ্ন-জড়ানো দিনে,
শ্রাবণ তাড়ানো উগ্র বিজলি জ্বলা
শত নিশ্বাসে আবিল রুদ্ধ ঘরে
আজ বাঁধা পড়ে আগামী কালের ঋণে।

দিন শেষ হয়, বৃষ্টিশেষের নেশা
নিষ্ক্রিয় মেঘে এখনো থমকি' আছে,
ক্ষণিক হলুদ-সবুজ সোনায় মেশা
অলীক সন্ধ্যা পুন বর্ষণ যাচে।
আহা, সুন্দর এ-পৃথিবী, এ জীবন,
বিনামূল্যেই অমূল্যতম দান,
পণ্যরাশির জঘন্য অনটন *
দেহধারীটারে যত দুঃখই দিক
অতল অগমে মুক্ত আমার প্রাণ।

জীবিকা-যন্ত্র যখনি দিয়েছে ছাড়া
তখনি শ্রাবণ পরালো আমার বুকে
সোনায় শ্যামলে গাঁথা তার মালাগাছি।
কত ভাগ্য যে বেঁচে আছি, বেঁচে আছি।

ক্লান্ত, মুক্ত, বিক্ষত, উৎসুক,
ক্ষুদ্র গৃহের দুর্গে চলেছি ফিরে,
কখনো আবার পাবো না যে-দিনটিরে
তারি শেষ স্মৃতি এখনো আকাশে আঁকা।
গলিটা বিশ্রী, পিচ্ছিল, আঁকাবাঁকা,
অসতর্কেরে বেঁধে কর্কশ খোয়া,
পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ওঠে তর্কের মতো
বাদলা দিনের ভিজে কয়লার ধোঁয়া।
বিষণ্ণতাব নিঃসাড়তার নেশা
আমার বুকের নিশ্বাস কেড়ে নিয়ে
বিশ্বের ছবি মুছে দেয় মন থেকে।
—ভাঙলো চমক বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে।

মৃদু ভঙ্গিতে আধেক দুয়ার ধ'রে
দাঁড়িয়ে আছে সে রঙিন শাড়িটি প'রে,
মাথার উপরে আধেক ঘোমটা টানা
আধেক ফেরানো মুখটি আড়াল ক'রে।
সব কেড়ে নিতে পারেনি দিনের ফাঁকি,
তবু আছে রাত, তবু কিছু আছে বাকি,
শূন্য মনের সুপ্তির গহ্বরে
পূর্ণতা এনে স্বপ্নের রেখাপাতে
সন্ধ্যাদীপের প্রতীক্ষা জ্বলে যেন
একখানা ক্ষীণ, কনকরিক্ত হাতে।

মনে হ'লো তারে চিনি, তবু চিনি না যে,
বুঝি না কী-কথা কেমন ছন্দে বলি,

দরিদ্রতার লক্ষ ছিদ্র ভ'রে
অবাধ, অগাধ, বিশাল শ্রাবণ ঝরে
কদম্ববনে বিকশে অন্ধ গলি।
হৃদয়-রূপক কিছু নেই, কিছু নেই,
নেই বেলফুল, রজনীগন্ধা, জুঁই,
চুপ ক'রে শুধু চেয়ে থাকি তার মুখে,
চোখ দিয়ে শুধু কালো চোখ দুটি ছুঁই।
চিরন্তনীর অলক্ষ্য অভিসার
পার হ'য়ে এসে তুচ্ছের বঞ্চনা
বলে কানে-কানে, 'আমার অঙ্গীকার
ভুলবো না আমি, কোনোদিন ভুলবো না।'

মায়াবী টেবিল

তাহ'লে উজ্জ্বলতর করো দীপ, মায়াবী টেবিলে
সংকীর্ণ আলোর চক্রে মগ্ন হও, যে-আলোর বীজ
জন্ম দেয় সুন্দরীর, যার গান সমুদ্রের নীলে
কাঁপায়, জ্যোছনায় যার ঝিলিমিলি স্বপ্নের শেমিজ
দিগ্বিজয়ী জাহাজেরে ভাঙে এনে পুরোনো পাথরে।
তাহ'লে উজ্জ্বলতর করো দীপ, যে-দীপের ছায়া
ঘাস, গাছ, রোদ্দুরের অন্তহীন আশ্চর্য কাপড়ে
পৃথিবীরে রূপ দেয়, যে রূপেরে লক্ষ হাতে হাওয়া
যদিও নিভাই ছেঁড়ে, তবু পাতাঝরার চীৎকার
হার মানে, স্তব্ধ হয়, ছন্দ পায় যার প্রতিভায়।
তাহ'লে উজ্জ্বলতর করো দীপ, করো অঙ্গীকার
সেই আলো, যে দেয় জীবনে মুছে, যৌবনে নিবায়,
রঙের তরঙ্গে বেঁধে তপ্ত মন খনির কোরকে—
ধাতুর প্রাণের পদ্মে, পাথরের রক্তের শিরায়
জ্বালায় অব্যর্থ, ধ্রুব, অক্ষয় চোখের হীরকে।

দ্রৌপদীর শাড়ি

রোদ্দুরের আঙুলে আঁকা
        মেঘের চেরা সিঁথি
হঠাৎ খুলে দিলো স্মৃতির
        অন্তহীন ফিতে।
এমনি এক মেঘলা দিন
সীমান্তের শাসনহীন,
ভবিষ্যৎ দেখা না যায়,
        অতীত হ'লো হারা।
দুঃস্বপনে পড়িলো মনে
        দ্রৌপদীর শাড়ি।

সেদিন মেঘে সোনার পাড়,
        রৌদ্র ভিজে-ভিজে ;
গাছের গায়ে আছাড় দেয়
        হাওয়ার হিজিবিজি।
দুপুর যেন বিকেল, আর
বিকেল হ'লো অন্ধকার ,
সন্ধ্যাকাশে উচ্চহাসে
        সূর্য পেলো ছাড়া।
দুঃশাসন করিলো পণ
        দ্রৌপদীর শাড়ি।

ভাঙলো ঘুম, লাল আগুন
        ধৈর্যহীন শিরায়
উল্লসিত তল্লোড়ের
        আনলো কড়া নাড়া।
আকাশে তারই স্বৈরাচার ,
কখনো নীল মেঘের ভার,

আলোর বাঘ কখনো ছায়া-
হরিণে করে তাড়া ;
আঁশার দাঁত চিবিয়ে ছেঁড়ে
দ্রৌপদীর শাড়ি।

স্বর্গে আব মর্ত্যে যেন
বাঁধিয়া দিলো সেতু
অচিব-পরিবর্ত্তনেব
তুমুল মত্ততা।
আলো-ছায়ার খেলার ঘরে
ভীষণ ঝড় ঝাঁপিযে পড়ে,
বজ্র শুনে লাফিয়ে ওঠে
বিদ্যুতের খাঁড়া,
মুষলধারে সাহস টানে
দ্রৌপদীর শাড়ি।

প্রতিশ্রুত হাতুড়ি এলো
অন্ধকারে ছুটে,
বাড়ালো হৃৎপিণ্ড তার
চাঁদের মতো মুঠি।
আকাশ ভ'রে উঠলো সোর,
মেঘের ঘোর, জলের তোড়,
মন্ত্র-পড়া অন্তরাল
দিলো না তবু সাড়া।
অসম্ভব দ্রৌপদীর
অন্তহীন শাড়ি।

রূপান্তর

দিন মোর কর্মের প্রহারে পাংশু,
          রাত্রি মোর জলন্ত জাগ্রত স্বপ্নে।
ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা,
          বস্তুপুঞ্জ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী,
               মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা।
জাগো, হে পবিত্র পদ্ম, জাগো তুমি প্রাণের মৃণালে,
          চিরন্তনে মুক্তি দাও ক্ষণিকার অম্লান ক্ষমায়,
               ক্ষণিকেরে করো চিরন্তন।
দেহ হোক মন, মন হোক প্রাণ, প্রাণে হোক মৃত্যুর সংগম,
               মৃত্যু হোক দেহ, প্রাণ, মন।

কোনো মৃতার প্রতি

'ভুলিবো না'—এত বড়ো স্পর্ধিত শপথে
জীবন করে না ক্ষমা। তাই মিথ্যা অঙ্গীকার থাক।
তোমার চরম মুক্তি, হে ক্ষণিকা, অকল্পিত পথে
ব্যাপ্ত হোক। তোমার মুখশ্রী-মায়া মিলাক, মিলাক
তৃণে-পত্রে, ঋতুরঙ্গে, জলে-স্থলে, আকাশের নীলে।
শুধু এই কথাটুকু হৃদয়ের নিভৃত আলোতে
জ্বেলে রাখি এই রাত্রে—তুমি ছিলে, তবু তুমি ছিলে।

বিকেল

গাছের সবুজে রোদের হলুদে গলাগলি,
পাতায়-পাতায় হঠাৎ-হাওয়ার বলাবলি,
উঁকি দেয় বুকে ভীরু কবিতার ক্ষীণ কলি—
          আহা, বিকেল! সোনার বিকেল!

রুদ্ধ ঘরের রোগশয্যায় কোথা থেকে
করুণ চিকণ রসের লিখন গেলো এঁকে,
শীতের শুকনো আকাশে রঙের কাঁপে কলি।
—আহা, বিকেল! ক্ষণিক বিকেল!

পৌষপূর্ণিমা

কিশোর-ঈষৎ-শীত কোনো রাত্রে যদি-বা দৈবাৎ
সচ্ছল শরৎ সাজে, আশ্বিনের ইচ্ছারে যদি-বা
পূর্ণ করে অপুষ্পক অঘ্রানের প্রচ্ছন্ন প্রতিভা

রাশি-রাশি সেই ফুলে, যে-ফুলে কখনো কোনো হাত
আনেনি স্পর্শের জরা, যার স্পর্শ, যত বাড়ে বাত,
তত নামে নারী হ'য়ে, রক্তমাংসহীন, অপার্থিবা,

অসীমচুম্বনী, তবু চুম্বনের অতীত, অতীবা,—
যে-গাছের সেই ফুল, তার নীল উল্লাস হঠাৎ
আকাশের শিরা দেয় ভ'রে : — তাতে কী? কেউ কি ছাখে?

বালিগঞ্জে বাড়ির গম্ভীর ভিড় যদি কোনো ফাঁকে
মেলে দেয় একটু সবুজ, ইলেকট্রিক আলো জেলে
অচন্দ্রচেতন যুবা ঘণ্টা দুই ব্যাডমিণ্টন খেলে,

রক্তমাংস তৃপ্তি খোঁজে খাদ্যে, তাপে, ব্যায়ামে, আরামে,
সবশেষে ঘুমের ঘনিষ্ঠ কোলে, একই নিদ্রা নামে
বস্তির ফুর্তিতে আর প্রাসাদের মর্মর বিষাদে :

আকাশে অসীম চাঁদ কলকাতায় শুধু বাদ সাধে
কুখ্যাত পাখির ঘুমে, কর্কশ চীৎকারে দিয়ে ডাক
ফুটপাতের গাছের বিছানা ছেড়ে উড়ে যায়, নীড়

খোঁজে মেঘের নরম মোমে, ব্যর্থ হ'য়ে তীক্ষ্ণ শাঁখ
বাজায়ে নিখাদ কণ্ঠে—উতরোল, উদ্‌ভ্রান্ত, অস্থির,

চাঁদেরে বন্দনা করে শুধু কাক—শুধু কাক—কাক।

প্রত্যহের ভার

যে-বাণীবিহঙ্গে আমি আনন্দে করেছি অভ্যর্থনা
ছন্দের সুন্দর নীড়ে বার-বার, কখনো ব্যর্থ না
হোক তার বেগচ্যুত পক্ষমুক্ত বায়ুর কম্পন
জীবনের জটিল গ্রন্থিল বুকে : যে-ছন্দোবন্ধন
দিয়েছি ভাষারে, তার অন্তত আভাস যেন থাকে
বৎসরের আবর্তনে, অদৃষ্টের ক্রূর বাঁকে-বাঁকে,
কুটিল ক্রান্তিতে, যদি ক্লান্তি আসে, যদি শান্তি যায়,
যদি হৃৎপিণ্ড শুধু হতাশার ডম্বরু বাজায়,
রক্ত শোনে মৃত্যুর মৃদঙ্গ শুধু,—তবুও মনের
চরম চূড়ায় থাক সে-অমর্ত্য অতিথি-ক্ষণের
চিহ্ন, যে-মুহূর্তে বাণীর আত্মারে জেনেছি আপন
সত্তা ব'লে, স্তব্ধ মেনেছি কালেরে, মূঢ় প্রবচন
মরন্ধ্রে, যখন মন অনিচ্ছার অবশ্য-বাঁচার
ভুলেছে ভীষণ ভার, ভুলে গেছে প্রত্যহের ভার।

অন্ধ প্রভু

রাজত্ব দিয়েছো, প্রভু, সকলেরে : শুধু নয় বাংলার জঙ্গলে
আগুন-রঙের বাঘ, আল্পসের কল্পনা-কৈলাসে
দারুণ ঈগল, বারুণী বরফে তপ্ত তিমি, শুধু
দীপ্ত দৃপ্ত দুর্জয়েরে নয়, দিয়েছো সবারে স্বত্ব
সহজাত রাজত্বের : ঘোলা-জল ধোবার ডোবায়
গলা-ডোবা কালো মোষ ভাদ্রের রোদ্দুরে, গলা-ফোলা, গলা-খোলা ব্যাং
বৃষ্টিশেষ বিকেলের হলুদ রোদ্দুরে, মেঘলা দুপুরে
আকাশে একলা কাক, কার্তিকের রাত্রিরের পোকা, মারীমত্ত মাছি,
রাক্ষস টিকটিকি : —সকলেরে রাজত্ব দিয়েছো, প্রভু, সকলেরই
প্রভুত্ব নিয়েছো মেনে। এ-স্বারাজ্য-সাম্রাজ্যে শুধু কি
বঞ্চিত শুধু কি আমি? আমি কবি! শুধু আমি
রাজ্যচ্যুত নির্বাসিত? অন্ন, শুধু প্রত্যহের অন্ন দিয়ে
আমার রাজত্ব নিলে কেড়ে? শুধু আমি প্রতি মুহূর্তের
অস্তিত্বের অস্বস্তির দাস? সত্যি তা-ই? না কি আমি, কবি-আমি,
কোলের কুকুর কিংবা জুয়োর ঘোড়ার মতো, সব,
সব স্বত্ব হারায়েছি অন্ধ, হীন প্রভু মেনে নিয়ে!

অসম্ভবের গান

বৃথাই জপিয়েছি তোমাকে, মন,
থামাও অস্থির চ্যাচামেচি।
কোথায় অর্জুন! কোথায় কামরূপ!
এক বসন্তেই শূন্য তূণ।

এক বসন্তেই শূন্য তূণ?
তাহ'লে আজো কেন শান্তি নেই?
কেন বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির
পাঞ্চালীরে রাখে পাশায় পণ?

কোনো বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির
জানে না কেন এই পরিশ্রম,
জানে না সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাশা
হঠাৎ কাঁপে কোন আকাঙ্ক্ষায়।

হঠাৎ কাঁপি কোন আকাঙ্ক্ষায়—
বৃথাই জপালাম তোমারে, মন—
উন্মাদিনী পাশা বরং ভালো,
আজো কি চিত্রাঙ্গদার আশা?

বরং প্রোজ্জ্বল জুয়োর চোখে
ছাখো-না ডুব দিয়ে কোথায় তল,
কিংবা মদিরার উদার বুকে
পাবে তো অন্তত অন্ধকার।

এখানে কিছু নেই, অন্ধকার,
শূন্য তূণ এক বসন্তেই,
এ-বনে কেন তবে আবার খোঁজো
অনিশ্চয়তার অসম্ভবে।

অনিশ্চয়তার অন্বেষণে
পাঞ্চালীরে পেয়েছিলে সেবার,
সে আজ এত দূর বিখ্যাত যে
স্বয়ং কৃষ্ণের সে-ই মধুর।

ফসল অন্যের, তোমার শুধু
অন্য কোনো দূর অরণ্যের
পন্থহীনতায় স্বপ্নে কেঁপে ওঠা
কোন অসম্ভব আকাঙ্ক্ষায়।

স্বপ্নে ওঠে রোল—কোথায় কামরূপ
কাঁপছে চিত্রাঙ্গদার ঠোঁটে!

হে বীর, ভাঙো ভুল। ব্রহ্মচারী তুমি?
—আবার বসন্তের হুলুস্থুল।

আবার বসন্তের হুলুস্থুল।
ব্রহ্মচারী তুমি, সব্যসাচী?
থামে না চ্যাচামেচি। যদি অসম্ভব,
তবে এ-তৃষ্ণার কোথায় মূল?

অনুবাদ

ডি. এইচ. লরেন্স

সাপ

একটা সাপ এসেছিলো আমার জলের জালায়
তপ্ত, উত্তপ্ত এক দিনে, গরমের জন্য আমি পাজামা প'রে—
সেখানে জল খেতে।

বিশাল, অন্ধকার ক্যারব গাছের গভীর, অদ্ভুত-সুরভি ছায়ায়
আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলুম আমার কুঁজো হাতে নিয়ে—
তারপর আমাকে অপেক্ষা করতে হবে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে,
কেননা জালার ধারে সে এসেছে আমার আগে।

সেই ছায়ায় সে মুখ বাড়ালো মাটির দেয়ালের একটা ফাঁক দিয়ে,
আর টেনে-টেনে নিয়ে গেলো তার পীত-পাটল শিথিলতা, পাথরের জালার
উপর দিয়ে, কোমল জঠরে,
পাথরের উপর রাখলো তার কণ্ঠ,
আর যেখানে কল থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে স্বচ্ছ স্বল্পতায়,
তার ঋজু মুখ দিয়ে চুমুক দিলো,
আস্তে পান করলো তার ঋজু মাড়ি দিয়ে, তার দীর্ঘ শিথিল শরীরের ভিতরে,
নিঃশব্দে।

একজন এসেছে জলের জালায় আমার আগে,
আর আমি, দ্বিতীয় আগন্তুক, অপেক্ষমান।

সে তার পান থেকে মাথা তুললো, যেমন ক'রে গোরুরা তোলে,
আর তাকালো আমার দিকে অস্পষ্টভাবে, পান-রত গোরু যেমন তাকায়,
লিকলিক ক'রে উঠলো তার দ্বিখণ্ডিত জিহ্বা তার ঠোঁটের ফাঁকে, একটু সে
ভাবলো,

তারপর নিচু হ'য়ে পান করলো আরো একটু,
সে, মৃৎ-পাটল, মৃৎ-সোনালি, পৃথিবীর জলন্ত জঠর থেকে,
সিসিলির গ্রীষ্মের এই দিনে, দূরে এটনা ধূমায়মান।

আর আমার শিক্ষার স্বর আমাকে বললে,
একে মারতেই হবে,
কেননা সিসিলিতে কালো, কালো সাপে দোষ নেই, সোনালি সাপই বিষাক্ত।

আর আমার মধ্যে অনেক স্বর ব'লে উঠলো, তুমি যদি পুরুষ হ'তে
তুমি তুলে নিতে লাঠি, ওকে ভাঙতে, ওকে শেষ ক'রে দিতে।—
কিন্তু আমি কি বলতে পারি না কী ভালো ওকে আমার লেগেছিলো,
কী খুশি আমি হয়েছিলাম, ও যে এসেছিলো চুপি-চুপি অতিথির মতো,
আমার জলের জালায় পান করতে,
আর তারপর, প্রশান্ত, শান্তিময়, কৃতজ্ঞতাহীন,
পৃথিবীর জলন্ত জঠরের মধ্যে চ'লে যেতে ?

এ কি ভীরুতা যে তাকে মারতে আমি সাহস পেলুম না ?
এ কি মনের বিকৃতি যে আমি চাইলুম তার সঙ্গে কথা বলতে ?
এ কি দীনতা যে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করলুম ?
এত সম্মানিত মনে হয়েছিলো নিজেকে।

আর তবু সেই সব স্বর
তুমি যদি ভয় না পেতে তুমি ওকে মারতে।

আর সত্যি আমি ভয় পেয়েছিলুম, ভীষণ ভয় পেয়েছিলুম,
কিন্তু তবু, তার চেয়েও বেশি সম্মানিত,
সে যে এসেছে আমার আতিথেয়তার সন্ধানে
সংগোপন পৃথিবীর অন্ধকার দরজা দিয়ে বেরিয়ে।

পান ক'রে তৃপ্ত হ'লো যখন,
সে মাথা তুললো, যেন স্বপ্নের ভিতরে, মাতালের মতো,

আর ঝলসালো তার জিহ্বা, এত কালো, যেন হাওয়ার উপর দ্বিখণ্ডিত রাত্রি,
ঠোঁট চাটছে যেন,
আর চারদিকে তাকালো দেবতার মতো, দৃষ্টিহীন, তাকালো বাতাসের মধ্যে,
তারপর আস্তে মাথা ফেরালো
আর আস্তে, খুব আস্তে, তিন-গুণ স্বপ্নের মধ্যে যেন,
তার মন্থর দীর্ঘতা আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে টেনে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলো,
উঠতে লাগলো আমার দেয়ালের ভাঙা পাড় বেয়ে।

আর সে যখন সেই ভীষণ গর্তের মধ্যে মাথা রাখলো,
আর যখন টেনে নিতে লাগলো নিজেকে, তার কাঁধ সাপ-সহজ ক'রে, ঢুকলো
আরো ভিতরে,
একটা বিতৃষ্ণা, সেই কুৎসিত কালো গর্তের মধ্যে তার অপসৃতির বিরুদ্ধে একটা
প্রতিবাদ
স্বেচ্ছায় তার এই কুৎসিত কালোর মধ্যে ঢুকে যাওয়া, আর তারপর আস্তে
নিজেকে টেনে নেয়ার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ
আমাকে আচ্ছন্ন করলো, যেই সে ফেরালো তার পিঠ।

আমি ফিরে তাকালুম, রাখলুম আমার কুঁজো,
হাতের কাছে যা পেলুম, তুলে নিলুম একটা চেরা কাঠ,
ছুঁড়ে মারলুম জলের জালার দিকে ঠাশ ক'রে।
আমার মনে হয় না তার লেগেছিলো
কিন্তু হঠাৎ, তার যেটুকু বাইরে ছিলো, তা বিশ্রী দ্রুত হ'য়ে কাৎরে উঠলো,
উঠলো বিদ্যুতের মতো কিলবিলিয়ে, তারপর গেলো চ'লে
সেই কালো গর্তের মধ্যে, দেয়ালের বুকে সেই মৃৎমুখী ফাঁকটুকু দিয়ে—
আর আমি, সেই শুব্ধ নিবিড় দুপুরে, মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলুম।

আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার অনুশোচনা হ'লো।
মনে হ'লো কী তুচ্ছ, কী স্থূল, কী হীন এই কাজ!
নিজের উপর এলো অবজ্ঞা, আর আমার অভিশপ্ত মানুষের-শিক্ষার উপর।

আর আমার মনে পড়লো অ্যালবাট্রসের কথা,
আর ভাবলুম সে যদি ফিরে আসতো, আমার সাপ!

কেননা তাকে আমার মনে হ'লো রাজার মতো,
নির্বাসিত রাজা, নিম্নলোকের মুকুটহীন রাজা,
এখন আবার আমরা মুকুট পরাবো তার মাথায়।

এমনি ক'রে একজনের সঙ্গে সুযোগ আমি হারালুম
জীবনের যে রাজা।
আর একটা অপরাধ রইলো আমার ক্ষালন করবার—
একটা হীনতা।

রাইনের মারিয়া রিলকে

ভিনাসের জন্ম

ভোরের আগে সেই রাত্রি ছিলো ভীষণ
রাত কেটে গেলো ছটফট ক'রে, হৈ-চৈ হুল্লোড়ে,
উল্লোল সমুদ্র খুলে গেলো আবার,
যেন ফেটে গিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো,
আর সেই চীৎকার যখন ভাটার টানে আস্তে এলো বুজে
আর আকাশে দিনের ম্লান উন্মেষ আর আলোর আরম্ভ
থেকে ফিরে এসে
আবার ডুবতে লাগলো বোবা মাছের অন্ধকারে—
সমুদ্র জন্ম দিলো।

প্রথম কয়েকটি রেখা কেঁপে কেঁপে ঝলসে উঠলো
পীন তরঙ্গ-যোনির ফেনিল ঘন চুলে
যোনিপ্রান্তে উঠে দাঁড়ালেন কন্যা,
শুভ্র, সিক্ত, উদ্‌ভ্রান্ত।

আর সবুজ তরুণ একটি পাতা যেমন একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে
আড়মোড়া ভাঙে, যা কুঁকড়ে লুকিয়ে ছিলো আস্তে-আস্তে খুলে যায়
তেমনি উন্মোচিত হ'লো কুমারীর শরীর
ঝিরঝিরে ঠাণ্ডায়, আঙুল-না-লাগা ভোরবেলার হাওয়ায়।

স্পষ্ট বেয়ে উঠলো উপরে
দুটি চাঁদের মতো জানু
উরুর উপচে-পড়া মেঘের মধ্যে ডুব দিলো,
জংঘার কৃশ ছায়াটি হঠলো পিছনে,
পা দুটি এগিয়ে এলো, হ'লো উজ্জ্বল,
আর দেহের সব ক-টি জোড় তেমনি জীবন্ত হ'য়ে উঠলো
যেমন জীবন্ত তাদের কণ্ঠ
যারা পান করছে সুরা।

আর উদরটি শ্রোণীচক্রের পায়ে
রইলো শুয়ে, যেন একটি তরুণ ফল ছোটো ছেলের কচি মুঠোয়,
আর সেখানে, নাভির সংকীর্ণ ভাণ্ড ভ'রে উঠলো
যে-অন্ধকারে, সে-ই তো এই প্রাণ, প্রাণের সমস্ত স্বচ্ছতা।
তারই তলায় আলগোছে উঁচু হ'য়ে
ক্ষুদ্র স্ফীতিটি উঠলো,
ঢেউ তুললো নিরন্তর কটিতটের দিকে
যেখানে থেকে-থেকে চিকচিক করছে একটি নিঃশব্দ জলরেখা।
যদিও ঈষদচ্ছ, স্তব্ধ আর ছায়াহীন
তবু এপ্রিলের একঝাড় রুপোলি বার্চগাছের মতো
রইলো প'ড়ে
উষ্ণ, শূন্য, অগুপ্ত, উন্মুক্ত যোনিদেশ।

দেখতে-দেখতে দুটি কাঁধের গতিশীল সুষমা
যষ্টির মতো ঋজু দেহটির উপরে স্থির হ'লো,

উঠলো বেয়ে শ্রোণীচক্র থেকে ফোয়ারার মতো
নামলো দুটি লম্বা বাহুতে বিলম্বিত লয়ে
নামলো দ্রুত, চুলের রাশি-রাশি ঝ'রে-পড়ায়।

তারপর ধীরে, অতি ধীরে মুখশ্রীর অগ্রসৃতি,
আনত ভঙ্গির পুরঃসংক্ষিপ্ত ম্লানতা
উজ্জ্বল উল্লম্ব উন্নীয়নে
হঠাৎ সমাপ্ত হ'লো চিবুকে।

এবার গ্রীবা দিলো বাড়িয়ে, যেন রোদ্দুরের একটি রেখা,
আর পুষ্পপ্রাণের প্রণালী, মৃণালের মতো বাহু,
বাহু দুটিও এগোতে লাগলো মরালের গ্রীবার মতো
যখন মরালের দল তীরের দিকে ফেরে।

তারপর এই শরীরের অস্পষ্ট উন্মেষে
লাগলো হাওয়া, উষসীর শিহরণ, প্রথম গভীর নিশ্বাস।
শিরার গাছে-গাছে কোমলতম শাখায় জাগলো গুঞ্জন,
আর তারপর রক্তের রোল আরো গভীরে ছড়িয়ে পড়লো,
আর এই হাওয়া হ'লো প্রবল, আরো প্রবল, আর তারপর
তার নিশ্বাসের সমস্ত শক্তি দিয়ে তীব্র আঘাত করলো
নূতন স্তন দুটিতে,
ভ'রে তুললো তাদের, নিজেকে ভ'রে দিলো জোর ক'রে
  তাদের মধ্যে,
আর তারা
দিগন্তে-ভ'রে-ওঠা ভরা পালের মতো
হালকা মেয়েটিকে তীরে নিয়ে এলো ঠেলে।

এমনি ক'রে দেবী মাটিতে নামলেন।

দেবী চললেন তারুণ্যের তীর দ্রুত ত্যাগ ক'রে,
আর তাঁর পিছনে
সমস্ত সকাল ভ'রে ফুটে-ফুটে উঠতে লাগলো
ফুল আর ঘাস, উষ্ণ, উদ্‌ভ্রান্ত,
যেন আলিঙ্গন থেকে উঠে-আসা। দেবী চললেন কখনো হেঁটে,
কখনো ছুটে।

কিন্তু দুপুরের পরে, বেলা যখন সবচেয়ে ভারি,
আরো একবার সমুদ্র ফুলে উঠে
ছুঁড়ে ফেললো ঠিক একই জায়গায় একটা শুশুক,
মরা, চ্যাঁড়া, লাল।

হেমন্ত

পাতা ঝরে, পাতা ঝরে, ঝরে পাতা যেন দূর থেকে,
যেন ঊর্ধ্বে ঝ'রে যায় দূরতম প্রান্তের কানন।
আরো, আরো ঝ'রে যায়, ভঙ্গিতে জানায় প্রত্যাখ্যান।

আর ধীর রাত্রির গহনে পৃথিবীর ভার ঝ'রে যায়
তারার শৃঙ্খল থেকে নিঃসঙ্গ আঁধারে।

আমরাও ঝ'রে যাই। এই হাত—তাও ঝ'রে পড়ে।
চরাচরে এই রোগ সংক্রমিত, মুক্তি নেই কারো।

তবু আছে একজন—তার হাত নির্ভার নির্ভরে
যত ঝরে, ধ'রে থাকে, তার ফাঁকে কিছুই ঝরে না।

শার্ল বদলেয়ার

চুল

অনেক, অনেকক্ষণ ধ'রে তোমার চুলের গন্ধ
টেনে নিতে দাও আমার নিশ্বাসের সঙ্গে ;
আমার সমস্ত মুখ ডুবিয়ে রাখতে দাও তার গভীরতায়
ঝরনার জলে তৃষ্ণার্তের মতো ;
সুগন্ধি রুমালের মতো তা নাড়তে দাও হাত দিয়ে
যাতে স্মৃতিগুলো ঝ'রে পড়ে হাওয়ায়।

তুমি যদি জানতে যা-কিছু আমি দেখি। যা-কিছু আমি শুনি।
যা-কিছু আমি অনুভব করি তোমার চুলের মধ্যে।
আমার আত্মা উড়ে চলে তার সৌগন্ধ্যে
যেমন অন্যদের আত্মা সংগীতের পাখায়।

তোমার চুলে সম্পূর্ণ একটি স্বপ্ন বিজড়িত,
সেখানে পালেব আর মাস্তুলের ভিড়,
তার মধ্যে অনেক বিশাল সমুদ্র, যাদের উপর দিয়ে
মনসুন আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় মোহময় দেশে
আকাশ যেখানে আরো নীল,
আরো গভীর,
যেখানে বায়ুমণ্ডল ফলে-ফলে সুরভি,
আর পাতায়, আর মনুষ্যচর্মে।

তোমার চুলের মহাসমুদ্রে আমি দেখছি
বিষণ্ণ গানে-গানে গুঞ্জিত এক বন্দর,
সেখানে সমস্ত জাতির বলশালী মানুষ,
আর সমস্ত রকম আকারের জাহাজ
তাদের সূক্ষ্ম, জটিল স্থাপত্য খোদাই করছে বিশাল আকাশে—
চিরন্তন উত্তাপের সেই ধাত্রী।

তোমার চুলের আদরের রাশিতে আমি ফিরে পেয়েছি
ভালো একটা জাহাজের কেবিনে
অনেক ফুলদানি আর ঠাণ্ডা জলের কুঁজোর মাঝখানে
ডিভানে শুয়ে কাটানো দীর্ঘ ঘণ্টার আলস্য,
বন্দরের অলক্ষ্য চঞ্চলতায় দোল খেতে-খেতে।

তোমার চুলের উজ্জ্বল চুল্লিতে
আমি আফিম আর চিনি মেশানো তামাকের ঘ্রাণ নিচ্ছি,
তোমার চুলের রাত্রিতে আমি দেখছি,
ঝলমল করছে ট্রপিক আকাশের অসীম নীলিমা,
তোমার চুলের পালক-নরম প্রান্ত বেয়ে-বেয়ে
আমি মাতাল হ'য়ে যাই
আলকাৎরা আর মৃগনাভির আর নারকোল তেলের মিশোনো গন্ধে।

আমাকে কামড়াতে দাও, অনেকক্ষণ ধ'রে, তোমার ঘন কালো গুচ্ছ-গুচ্ছ চুল।
স্প্রিং-এর মতো বেশামাল, বিদ্রোহী তোমার চুল
আমি যখন দাঁত দিয়ে কুটকুট ক'রে কাটি
আমার মনে হয়, আমি একটু একটু ক'রে স্মৃতিগুলোকে খাচ্ছি।

সন্ধ্যা

সন্ধ্যা আসে, মোহিনী সুন্দরী সন্ধ্যা, দুষ্ক্রিয় দুর্জনে
সখ্য দেয়, আসে যেন ষড়যন্ত্রী, মার্জারচরণে,
বিশাল কক্ষের মতো আকাশ ক্রমশ বোজে, আর
অধীর মানুষ নেয় পশুত্বের বন্য অঙ্গীকার।

হে সন্ধ্যা, মধুর সন্ধ্যা, তুমি তারই ঈপ্সিত প্রহর,
হাতে যার আজিকার দিনব্যাপী শ্রমের স্বাক্ষর
সত্যই অঙ্কিত!—তুমি সেই সব আত্মার সান্ত্বনা,
দুরন্ত দুঃখের তাপে দগ্ধ যারা, যে-অনন্যমনা
পণ্ডিতের নতশির এতক্ষণে ভারাক্রান্ত হয়,
যে-শ্রমিক ন্যুব্জপৃষ্ঠে ফিরে পায় শয্যার আশ্রয়।

ইতিমধ্যে ব্যাধিগ্রস্ত পিশাচেরা, ক্রূর, রক্তশোষা,
গুরুভারে জেগে উঠে শুরু করে দৈনিক ব্যবসা,
খড়খড়ি কাঁপায় তারা, পরদা ছেঁড়ে, দরোজা ধাক্কায় ;
বাতাঘাতে উৎপীড়িত আলোকের অস্থির ছায়ায়
রঙিন গণিকাবৃত্তি প্রজ্বলিত হ'লো ইতস্তত
পথে-পথে, অবাধ পুরীষস্রাবী বল্মীকের মতো ,
খোলে সে নিগূঢ় পথ দিকে-দিকে , চতুর সংকেতে
আকস্মিক অতর্কিত আক্রমণে শত্রু যেন জেতে ;
ক্লেদের নগর এই—তার বুকে চলে এঁকে-বেঁকে,
যেমন শঙ্কিত কৃমি মানুষের চক্ষু থেকে ঢাকে
খাদ্য তার। এদিকে ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দে জাগে রান্নাঘর
এখানে-ওখানে , অর্কেস্ট্রা উল্লসে , ওঠে তারস্বর
রঙ্গমঞ্চে , আর শস্তা রেস্তোরাঁয়, যেখানে জুয়োর
ফুর্তির উৎসাহ জমে, জোটে বেশ্যা, মাতাল, জোচ্চোর,
তাদের সাকরেদ যত , জোটে চোর, পিশুনস্বভাবে
প্রতিশ্রুত , অবিলম্বে সেও যাবে, সেও কাজে যাবে,
মৃদু হাতে দরজা খুলে, বাক্স ভেঙে, হয়তো কুড়াবে
দু-দিনের অন্ন তার, কিংবা উপপত্নীরে সাজাবে।

মগ্ন হও, এ-গম্ভীর লগ্নে তুমি মগ্ন হও, মন
ভাবনায় , রুদ্ধ করো কর্ণদ্বার। এই সেই ক্ষণ,
যখন রোগীর দুঃখ তীক্ষ্ণ হয় , অন্ধ কালো রাত
আঁকড়ে তাদের কণ্ঠ , সন্নিকট তাদের নিপাত,
নিয়তির পূর্ণতায়, সর্বগ্রাসী, সামান্য পাতালে ,
ওঠে ব্যাপ্ত দীর্ঘশ্বাস, ঘন হ'য়ে নামে হাসপাতালে।
এর মধ্যে একাধিক, ব্যঞ্জনের সৌরভের আশে
ফিরবে না আপন ঘরে, রাত্রিকালে, দোসরের পাশে।

উপরন্তু অনেকেই বোঝেনি, জানেনি কোনোদিনই
গৃহকোণে মধুময় শান্তি , এরা কখনো বাঁচেনি।

উষা

প্রভাতী বিউগিলে জাগে ব্যারাকের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ,
সদ্যোত্থিত হাওয়ায় লণ্ঠন কাঁপে।

এই-তো এখন

অসুস্থ স্বপ্নের ঝাঁক বিকারের বীজাণু ছড়িয়ে
শ্যামল কিশোরদলে রেখে গেলো পেঁচিয়ে-মুচড়িয়ে
শয্যা-'পরে, লণ্ঠনের রক্তচক্ষু কেঁপে-কেঁপে ঘুরে
যেন লাল ব্রণচিহ্নে সদ্যোজাত, দুর্বল দিনেরে
এঁকে দিলো. দিন আর লণ্ঠনের যুদ্ধের নকলে
আত্মা চায় গুরুভার দুর্মেজাজ দেহের দখলে
ছেড়ে যেতে। বাতাস, অশ্রুল মুখ, হাওয়ায় মোছানো,
বিকম্পনে ভ'রে যায়, ব্যাকুল গলায় কারা যেন,
লিখে-লিখে ক্লান্তি এলো পুরুষের, রতিতে নারীর।

এখানে ওখানে গৃহে ধোঁয়া ওঠে। নির্জীব শরীর
আলুলিত, বিবর্ণ চোখের পাতা, হাঁ খোলা, নির্বোধ,
রঙ্গময়ী নাগরীরা আবিল আবেশে নেয় শোধ
প্রমথিত অনিদ্রার, অনাথারা ঠাণ্ডা, রোগা স্তন
ঝুলিয়ে ফুঁ দেয় কাঠে, আঙুলেও। এই সেই ক্ষণ,
যখন প্রসূতি নারী অবরোধে, কার্পণ্যে, ঠাণ্ডায়
তোলে তীব্র আর্তনাদ প্রখরিত গর্ভযন্ত্রণায়,
সফেন শোণিতে দীর্ণ ফোঁপানো কান্নার মতো ঐ
কুক্কুটের তানে ছেঁড়ে কুজ্ঝটিকা, ছড়ায় অথই
কুয়াশা, বন্যার মতো, ডোবায় প্রাসাদশ্রেণী, আর
হাসপাতালে গভীর গহ্বরে, মুমূর্ষুরটায় তার
করাল ঘর্ঘরধ্বনি, নাভিশ্বাসে, অসম বমনে।
লম্পটেরা ঘরে ফেরে—আছে কাজ, প'ড়ে গেছে মনে।

উষা, দাঁতে-দাঁত-লাগা, নির্জন সীনের তীরে
সবুজ-লোহিত সাজে অগ্রসর হ'লো ধীরে-ধীরে।

ধূসর প্যারিস জেগে, চোখ রগড়ে, এখনই আবার
কর্মঠ বৃদ্ধের মতো হাৎড়ায় যন্ত্রপাতি তার।

স্তোত্র

প্রিয়তমা, সুন্দরীতমারে—
যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার—
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার!

বাতাসের সত্তার লবণে
বাঁচায় সে জীবন আমার,
তৃপ্তিহীন আত্মার গহনে
গন্ধ ঢালে চিরন্তনতার।

অক্ষয় সৌরভ মাখে হাওয়া
কৌটো থেকে, কোনো প্রিয় ঘরে;
সংগোপনে, কোনো ভুলে-যাওয়া
ধূপদানি জ্বলে রাত্রি ভ'রে।

কেমনে, অম্লেয় প্রেম, ধরি
ভাষায় তোমারে অবিকার,
এক কণা অদৃশ্য কস্তুরী
শাশ্বতের অন্তরে আমার!

সে-উত্তমা, সুন্দরীতমারে—
স্বাস্থ্য আর আনন্দ আমার—
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার!

শব

কী আমরা দেখেছিলাম সেই গ্রীষ্মের প্রসন্ন
  সুন্দর সকালবেলায়, হঠাৎ রাস্তায় মোড়ে
পাথর-পাতা বিছানায় একটা পশুর শব, গলিত, জঘন্য,
  বঁধু, তোমার মনে পড়ে?

পিচ্ছিল রমণীর মতো, শূন্যে পা দুটি তুলে,
  তাপে, ঘামে বিষ পড়ছে চুঁইয়ে,
তার মস্ত প'চে-যাওয়া দুর্গন্ধি উদর দিচ্ছে খুলে
  চক্ষুলজ্জা খুইয়ে।

এই ঘিনঘিনে ঘাগুলোকে যেন রান্না করবে ব'লে
  রোদ্দুর ঝরলো তার উপরে,
টুকরো ক'রে ভেঙে-ভেঙে ফিরিয়ে দেবে পরম প্রকৃতিকে, যা সুকৌশলে
  তিনি মিলিয়েছিলেন এক ক'রে.

আর এই চমৎকার শবটি, আকাশ দেখলো চোখ মেলে,
  ফুটে উঠছে ফুলের মতো।
এমন দারুণ দুর্গন্ধ যে তুমি হয়তো ভেবেছিলে
  অজ্ঞান হ'য়ে পড়বো না তো?

বসেছে ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছি সেই পূতিস্ফীত উদরে, যেখান থেকে
  কালো-কালো অক্ষৌহিণী কৃমি আসছে বেরিয়ে
ঘন স্রোতে, ময়লা জলের মতো এঁকে-বেঁকে
  তার জ্যান্ত নাড়িভুঁড়ির প্রান্ত দিয়ে।

এই সমস্ত উঠছে আর পড়ছে, যেন ঢেউয়ের ছন্দে,
  কিংবা ন'ড়ে উঠছে হঠাৎ স্পন্দনে,
দেখে মনে হ'তে পারতো এই শরীরটা, যেন শিথিল নিশ্বাসে ভরা, মহানন্দে
  বেঁচে আছে তার এই প্রজননে।

আর এই জগৎটা থেকে অদ্ভুত সুর পড়ছে ছড়িয়ে
স্রোতের মতো, হাওয়ার মতো স্বরে,
কিংবা যেন ধান ভানার ছন্দ, যখন ললিত হাতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে
কুলো থেকে ফসল তোলে ঘরে।

রূপ, গড়ন মুছে যায়, হ'য়ে যায় স্বপ্ন শুনশান,
নকশা ফিরে আসে না সহজে
ভুলে-যাওয়া পটের উপর, কিন্তু শিল্পী তাকে ফিরে পান
স্মৃতি, শুধু স্মৃতির গরজে।

পাথের পিছন থেকে একটা লোম-ওঠা
অধীর কুক্কুরী, রাগি চোখে
লক্ষ্য করছিলো আমাদের—কখন ফিরে পাবে তার ফেলে-আসা টুকরোটা
ঐ কঙ্কালের ফাঁকে।

—আর তবু, তুমি—তুমিও হবে এই পুতীযের প্রাচুর্য,
এই দারুণ দুর্গন্ধ,
তুমি, আমার চোখের তারা, আমার সত্তার সূর্য,
আমার দেবী, আমার আনন্দ।

হ্যাঁ, তুমিও তা-ই হবে, সৌন্দর্যের রানী আমার,
যখন, শেষ মন্ত্র পড়া হবার পরে,
তুমি পচবে হাড়ের মধ্যে শুয়ে-শুয়ে, আর মোটা-মোটা ফুলের বাহার
গজিয়ে উঠবে তোমার দুর্গন্ধের উপরে।

তখন, প্রিয়তমা, তোমাকে চুমোয়-চুমোয় ভোজন করবে যে-সব কৃমি,
এ-কথা তাদের বলতে ভুলো না,
যে আমার ছিন্নভিন্ন বিধ্বস্ত ভালোবাসার দিকে তাকিয়ে দেখেছি আমি,
দেখেছি তার আকৃতি, তার স্বর্গীয় নির্যাস, তার ছলনা।

আলবাট্রস

মাঝে-মাঝে, কৌতুকের খেয়ালে, জাহাজের মাঝিমাল্লা
ধরে সেই বিশাল সমুদ্র-পাখি, আলবাট্রস,
জাহাজের সঙ্গে, লোনা জলের তিক্ত তরঙ্গে, যে পাল্লা
দেয় সাত-সাগর পার হ'য়ে, আকাশে পাখা মেলে, অলস।

যখনই তাকে ডেকের উপর রাখলো ওরা
তখনই এই নীলিমার সম্রাট, লজ্জা পেয়ে, থতোমতো,
ছেঁচড়ে চলে বিশাল শুভ্র করুণ তার ডানাজোড়া
ভাঙা দুটো নাজেহাল দাঁড়ের মতো।

এই আকাশযাত্রী, কী দুর্বল সে হ'য়ে যায়, যার দাপটে
মেঘ ছেড়ে দিতো পথ। একটু আগেও এত যে সুন্দর ছিলো,
কী কুৎসিত এখন, জবড়জং,
কেউ হুঁকোর নল দিয়ে শুড়শুড়ি দেয় তার ঠোঁটে,
কেউ বা খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে নকল করে তার ডাঙায় চলা বেয়াকুব ঢং।

কবিও তা-ই, মেঘলোকের রাজপুত্র, শিকারীর তীর
হাসিতে খানখান ক'রে দিয়ে ঝড়ের বুকে তার আনাগোনা,
এই পৃথিবীতে নির্বাসিত, যেখানে ব্যস্ততা, চীৎকার, ভিড়—
তার বিরাট ডানা বাধা দেয় তাকে, তাই চলতে পারে না।

এজরা পাউণ্ড

বিবাদ-গাথা

শত্রু, সে যে শত্রু, তার এই-তো খেলা
আড়াল থেকে যুদ্ধ চালায়।

আমার প্রাণ একলা শুয়ে ডাকলো কত
শিশু যেমন ঘুমের সময়,
আমার হাত খুঁজলো তারে সমস্ত রাত—
প্রেমিক হাত সে কি ঘুমোয়।

কিন্তু শোনো, সবার উপর সত্য এই :

ডাকবে তারে শত্রু ব'লে, শত্রু সে যে, আড়াল থেকে যুদ্ধ চালায় ;
মিলবে তার সঙ্গে যেমন রাতের হাওয়া অশ্লেষার প্রান্তে মিলায়।

প্রেমের খেলা খেলেছি কত বার,
ছুঁড়েছি পাশা সত্য ক'রে পণ,
স্বচ্ছ চোখে হেরেছি তার কাছে
ব্যথার পূজা করিনি নিবেদন।

বাকি কিছুই নেই তো আর, লাফিয়ে উঠি নগ্ন ধার,
কিন্তু শোনো, এ ছাড়া আর সত্য নেই :

যে হারে তার শত্রুতায় সমান-সমান
ফিরতি প্যাঁচে সে-ই জেতে।
বিদ্যুতের লাল আগুন ছুঁড়েও দেখি
অন্ত শেষ নেই এতে :
তার কাছে যার তলোয়ারের ভাঙলো জোব
কিস্তিশেষে সে-ই জেতে।

শত্রু, সে যে শত্রু, তার এই তো খেলা, আড়াল থেকে কুটিল চাল।
যে-অভাগায় হারাতে তার অবহেলা তারই যে চাই কঠিন ঢাল।

এজরা পাউণ্ড অবলম্বনে

অমরতার গান

প্রেমের গান গাও, কুঁড়েমি করো,
প্রেমের গুণ গাও, কুঁড়েমি করো,
কী হবে আর সব দিয়ে বা।

খুব তো ছোটা হ'লো দূরের পিছে
চোখের মাথা খেয়ে পুঁথিও লুঠ,
প্রেমের হুন খেলে ও-সব মিছে,
কী হবে আর সব দিয়ে বা।

মনস্তাপে ফুল যায় তো ঝ'রে যাক,
আমার সুখ সে তো আমার আছে ,
প্রেমের গানে সব আবার বাঁচে,
কী হবে আর সব দিয়ে বা।

কেমনে তিব্বতে রাস্তা খুঁড়ি,
কেমনে তেহেরানে মন্ত্রী হই,
কেমনে কাবুলের তক্তে চড়ি- -
কুঁড়ের গান সে তো ফুরায় না।

ই. ই. কামিংস

যখন র'বো না আর মর্ত্য ছাঁচে

যখন র'বো না আর মর্ত্য ছাঁচে

আমার দু-চোখ থেকে ঝুলবে গাছে
গাছের ফুর্তিভরা ফলের চিকন

বৃন্তে দিগন্তের নারেঙ্গি রং
আমার ঠোঁটের ফাঁকে স্তম্ভিত গান

আনবে গোলাপে কান্নার উজান
কামতাপিত কুমারী তার ছোট্ট গোপন

স্তনের ফাঁকে সে-ফুল করবে রোপণ
আমার আঙুলে বেগ তুষার খুঁড়ে

পাখির পরিশ্রমে চলবে উড়ে
উঠবে ঘাসের পথে ঢেউ সে-পাখার

যেখানে একলা হাঁটে কান্না আমার
এদিকে সমুদ্রের রক্তে দ্বিগুণ

তুলবে আমার হৃৎপিণ্ড দারুণ

হে সুন্দরী স্বতঃস্ফুট পৃথিবী কত বার

হে সুন্দরী
স্বতঃস্ফুট পৃথিবী কত বার
চিমড়োনো চিন্তাশীলের নোংরা ঘুণধরা
অশ্লীল
        আঙুল তোমাকে
খুঁটে
খুঁচিয়ে
চিমটি কেটে অস্থির করেছে

তোমাকে
,বিজ্ঞানের বজ্জাত বুড়ো আঙুল তোমাকে
টিপে
টিপে
খুঁজেছে তোমার
            মাধুরী   ,কত

যার পালে-পালে পুরুৎ তোমাকে
হাড্ডিসার হাঁটুতে তুলে
চেপে
চেপে

ফুর্তি ক'রে জন্মাতে চেয়েছে তোমার গর্ভে
দেবতা
          (কিন্তু
তুমি

তোমার ছন্দে-বাঁধা
মৃত্যুদয়িতের
অপরূপ বাসরে সতী তুমি

                              তাদের জবাবে শুধু
বসন্তের ফুল

                    ফোটাও

ওয়ালেস স্টীভন্স

নির্জন প্রাসাদ

মন্দ হ'লো ? আশা ক'রেই এসেছিলাম,
এসে দেখি সেই বিছানায় কেউ নেই।

থাকতো যদি এলোচুলের সর্বনাশ,
ঠাণ্ডা হাতের কঠিন চোখের বিরুদ্ধতাও।

থাকতো যদি খোলা পাতায় একলা আলো
একটি-দুটি হৃদয়হীন পদ্যে ফেলা।

থাকতো যদি পরদা জুড়ে অন্ধকার
শুধু হাওয়ার অন্তহীন নির্জনতা।

হৃদয়হীন পঙ্ক ? দুটি-চারটি কথায়
কেবল সুর বাঁধা যে সুর বাঁধা যে সুর বাঁধা।

ভালোই হ'লো। সেই বিছানায় কেউ নেই,
ভব্যতার শক্ত ভাঁজে পরদা ফেলা।

চীনে কবিতা : হান ইউ (৭৬৮-৮২৪)

পাহাড়ি পথ

সরু পথ বেয়ে পাহাড়ে উঠলাম,
পাথরে পা কাটলো।
থামলাম না, মন্দিরে চলেছি।
পৌঁছতে দেরি হ'লো।
সন্ধ্যা তখন, অন্ধকারে বাদুড় নড়ছে,
মণ্ডপের ঠাণ্ডায় গা জুড়োলো।
সেখানে ফুল ফুটেছে টগর, মস্ত কলাপাতা হাওয়ায় দুলছে—
আহা, বৃষ্টি-ভেজা।
ভিতরে আঁকা আছেন তথাগত, এসো দেখবে,
ব'লে পুরুৎঠাকুর সঙ্গে চললেন আমার,
আলো এনে তুলে ধরলেন দেয়ালে—
আশ্চর্য ছবি।
মাদুর ঝেড়ে দিলেন নিজের হাতে, আনলেন খাবার,
লাল চালের মোটা ভাত, অড়র ডাল, সন্ধব নুন।
খিদে মিটলো।
রাত হ'লো, শুয়ে-শুয়ে একটি পোকার ডাকও আর শুনি না,
চাঁদ এলো আমার ঘরে, শান্ত, সুন্দর।...

ভোর হ'তেই বেরিয়ে পড়েছি আবার, ঘুরতে-ঘুরতে
পথের ভুল হ'লো,
এই লুকোই, এই বেরোই, ওঠা-নামার ঘোরপ্যাঁচ
ফুরোয় না।
এদিকে ঘন কুয়াশায়
বেগনি রং ধরলো পাহাড়ে, ছড়িয়ে গেলো সবুজ,
আকাশ থেকে ঝর্নার জলে ঝলমল।
চলেছি পাইনবন পেরিয়ে,
হঠাৎ ওকগাছের ধার ঘেঁষে—প্রকাণ্ড, দশ জোয়ান
বেড় পায় না—
নামছি ঝর্নার খরস্রোতে কাঁকর মাড়িয়ে,
হাওয়ায় গান ওঠে ছলছল⋯ ছলছল।
চলো,
কাপড় ভেজে ভিজুক,
মিলাক আরো দূরে শহর,
প'ড়ে থাক পিছনে আমার আপন দেশ, আমার পুঁথিপত্র,
রাজার কাছে দরবার।
আমার কাজ কিছু শেষ হয়নি, না-ই বা হ'লো,
আমার বাছা-বাছা তুখোড় ছাত্ররা স'সে থাকবে—
ক-দিন আর থাকবে।
আমি বুড়ো হয়েছি, আমার এখানেই ভালো।

য়ুয়ান চন (৭৭৯-৮৩৯)

মৃতা পত্নীকে

বাপের ছোটো মেয়ে, আদরিণী তুমি,
অদৃষ্টের দোষে এই গরিব পণ্ডিতের হাতে পড়লে।
আমার ছেঁড়া জামায় চোখ নামিয়ে যখন রিপু করতে,
আমি মিষ্টি কথায় তোমার মন ভিজিয়ে, আস্তে

একটি দুটি সোনার কাঁটা খুলে নিতাম খোঁপার—
মদ কেনা চাই তো।
রাঁধতে বুড়ো আনাজ
পাতা পুড়িয়ে উনুন জেলে।
…আজ শুনছি ওরা সভা ডাকছে, আমার লাখ টাকার ডালি নাকি তৈরি—
আজ তোমায় কী দেবো তা-ই ভাবি।
তোমার নামে মন্দিরে পুজো ?   এই ?

২

কে আগে মরবে বলো তো ?   আমি।   না, আমি!
কত ঠাট্টা দু-জনে ব'সে করেছি।
একদিন হঠাৎ তুমি চ'লে গেলে—
আমার চোখের উপর দিয়ে, তুমি।
তোমার জামাকাপড় সবই প্রায় বিলিয়ে দিলাম,
তোমার শেলাইয়ের বাক্স খুলে দেখতে সাহস হয় না।
ঝি-চাকর সকলের দিকে তোমার হাত ছিলো দরাজ,
আমিও সেটা রেখেছি, কিন্তু তোমার মতো হয় না।
··বুদ্ধের কথা সত্য, বেঁচে থাকলে প্রিয়বিয়োগ হবেই,
কেউ নিস্তার পায় না,
তবু বলি, একসঙ্গে আধপেটা খেয়ে দিনের পর দিন যাদের
      কেটেছে,
এ-দুঃখ তাদের মতো কি আর কারো।

৩

দুঃখ শুধু তোমার জন্য ?
না, নিজের কথাও ভাবি।
সত্তর হ'তে কত আর দেরি আমার ?
আমি তো ভালো-মন্দয় সাধারণ—
দেখেছি মহৎ মানুষ, কে জানে কার শাপে নিঃসন্তান।
আমি তো চলনসই পদ্য লিখি,

শুনেছি মহাকবির কথা, তাঁর ডাকেও ওপার থেকে
সাড়া দেননি ঘরনী।
মৃত্যুর পরে মিলন ?
বিশ্বাস করি না, তুমিও কোনোদিন করোনি।
সেই অন্ধকারেই শেষ, আর আশা নেই, জানি।
তবু
রাত্রি ভ'রে চোখ মেলে তাকিয়ে
আমি দেখতে পাই
তোমার মেঘলা কপালে
তোমার সমস্ত জীবনের সংসার চালাবার
দুশ্চিন্তা।

লি পো (৭০১-৬২)

আমার পিতৃব্য রাজগ্রন্থাগারিক ইউন-এর বিদায়-ভোজে

আহা সেই যৌবনের দিন দিয়েছি ছড়িয়ে উড়িয়ে।
কত হাসি কত গান,
বন্ধুমহলে সুশ্রী মুখের ঝাঁক। আজ হঠাৎ
ফুরোলো গান বুড়ো হলাম বুঝি না বুঝেও বুঝি না !

তবু ফিরে আসে বসন্ত, দেখে মন ভরে আনন্দে।
এখনই, বন্ধু, যাবে ?
এসো তবে এই একটু সময় হালকা ওড়াই
সুখের হাওয়ায়। বাইরে চলো।

মুকুল ধরেছে আমের ডালে, ডাকছে পাখি,
আনো সুরা, আনো গান।

বিকেলের আলো পাহাড়ের পায়ে লুটোয়,
এসো আর-একটু বেড়াই।

একটু পরেই কেউ আর নেই, অন্ধকার।   বাঁশের ঝাড়
কী-চুপচাপ।
রাত কত হ'লো, এবার দরজা বন্ধ করো।

ছোটোদের কবিতা

রামধনু

'বীরু, বুলু, রবি সব ছুটে আয়—
তিনু, মিলি আর মনু,
চাস যদি তোরা দেখতে একটা
সাতরঙা রামধনু!
বাবা-মা এসো গো, বামা-ঝি, রামজী,
এসো ছোড়দাদা, ন'দি—
আকাশ-জোড়া এ-রামধনু চাও
দেখতে যদি।'

ছোট্ট কমল, দুষ্টু কমল
ভুলে গিয়ে বল খেলা,
চীৎকার ক'রে ডাকলো সবায়
সেদিন বিকেলবেলা।
বৃষ্টির পরে ঝিলিমিলি রোদ
ঝিকিমিকি রামধনু;
ছুটে এলো রবি, বীরু আর বুলু,
মিলি আর তিনু, মনু।

ছোট্ট পায়ের শব্দে, পাখির
কিচিরমিচির চুপ।
হালকা হাতের হাততালি শুনে
গাছগুলি খুশি খুব।
মিষ্টি কথার ঢিল খেয়ে-খেয়ে
ফুলপাতা টলমল—
ছোট্ট কমল, দুষ্টু কমল,
মিষ্টি কমল!

মিষ্টি সবাই, দুষ্টু সবাই
ছোট্ট সবাই—
ঠিকরে কোথায় ছুটে ছিটকায়,
নেই ঠিক-ঠিকানাই।
বুলু, বীরু, রবি চোখ তুলে চায়,
মিলি, তিনু আর মনু—
লাফায়, চ্যাচায়, চোখ তুলে চায়,
চোখ তুলে ভাখে আকাশের গায়
ঝলমল রামধনু।

মা-বাবা তখন চায়ের টেবিলে,
বামা-ঝি সাজছে পান,
রামজী হেঁশেলে মশলা পিষছে,
ছোড়দা করছে স্নান।
ছোটো আরশিতে চুলের খোঁপাটা
দেখছে ন'দি ;—
'শিগগির ছুটে এসো, রামধনু
দেখবে যদি।'
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো কমল,
বীরু, বুলু, মিলি, মনু—
আকাশের গায় এক মিনিটের
সাতরঙা রামধনু।

পেয়ালা ফুরুলে মা-বাবা গেলেন
ন'দি খোঁপা ঠিক ক'রে,
ছোড়দাও এলো— গন্ধ-রুমাল
পকেটে ভ'রে।

ঝামা-ঝি এলো না—সাজছে সে পান
একলা ব'সে,
রামজী এলো না— রাতে রান্নার
মশলা পিষছে ক'ষে।

বাবা-মা বলেন, 'কোথায় ? কোথায় ?'
ন'দি এসে বলে, 'কই ?'
ছোড়দা বলছে, 'কিছু তো দেখিনে,
আকাশে আকাশ বই।'
ওরা সাতজনে ছুটোছুটি করে,
হাততালি দিয়ে নাচে,
ওরা সাতজনে উল্টিয়ে পড়ে,
হেসে না বাঁচে।
'আমরা দেখেছি, আমরা দেখেছি,
তোমরা অন্ধ হ'লে !'
দুষ্টু কমল নাচে আর হাসে
এ-কথা ব'লে।
বীরু, বুলু, রবি নাচে আর হাসে,
তিনু, মিলি আর মনু—
'আমরা দেখেছি—আমরা দেখেছি
ঝলমল রামধনু !'

ঘুমের সময়

জ্বলিছে নরম মোম
ছোটো মোর ঘরে,
জ্বলিছে নতুন চাঁদ
মেঘের শিয়রে।
এক মুঠো ছোটো চাঁদ,
কত আলো তার,
এক মুঠো মিঠে আলো
বালিশে আমার।
মোমের নরম চোখে
স্বপ্নেরা ঝরে,
ঘুমের নরম চুমো
দুই চোখ ভ'রে।

পরিমল-কে

পদ্য যদি লিখতে তুমি পরিমল,
মুগ্ধ হতাম সকলে,
হার মানাতে নামজাদা সব কবিদের
ছন্দ-মিলের দখলে।
যত কথা—আজগুবি আর অসম্ভব
ঘুরছে তোমার মগজে,
দয়া ক'রে কলম নিয়ে একটানা
লিখতে যদি কাগজে!
কিন্তু তুমি নিজে কিছুই লিখলে না—
আমায় দিলে উৎসাহ,
তুমি আমায় করলে তোমার রাজকবি,
আমি তোমায় বাদশাহ।

ফল যা হ'লো, দেখতে তো তা পাচ্ছোই—
এই যে ছোটো বইখানা,
আগাগোড়া একটি ছড়াও নেই এতে
তোমার যেটা নয় জানা।
পাবো অনেক নিন্দে, খানিক প্রশংসা,
কে-ই বা গায়ে তা মাখে!
ভালোবাসার সঙ্গে দিলাম, পরিমল,
আমার এ-বই তোমাকে।

আমরা যখন ছোটো ছিলাম, পরিমল,
মনে কি নেই কী হ'তো?
ইচ্ছে হ'লেই চ'লে যেতাম ইস্পাহান,
কটোপাক্সি, কিয়োতো।
জ্যোছনা রাতে দেখতে পেতাম পরিদের
জানলা থেকে লুকিয়ে,
অন্ধকারে ভূতের পায়ের আওয়াজে
রক্ত যেতো শুকিয়ে।
এখন—মোরা যেথায় আছি, দিনরাত
আটকে আছি সেখানেই,
চাঁদের আলোয় নাচে না আর পরিরা,
ভূত-পেরেতের দেখা নেই।
কিন্তু তোমার সঙ্গে থেকে, পরিমল,
ফিরলো মনে সেই সব,
মনে হ'লো রাখবো বেঁধে কবিতায়
তোমার আমার শৈশব।
অমনি, অ্যাখো, কাগজ নিলাম একরাশ,
কালি নিলাম দোয়াতে,
যা লিখেছি উজাড় ক'রে, পরিমল,
দিলাম তোমার দু-হাতে।

বাবার চিঠি

আমি যদি হতেম ছোটো পাখি
থাকতো যদি ছোট্ট দুটি পাখা,
তোমার কাছে উড়ে যেতাম চ'লে।

শ্রাবণ-মেঘ যেমন দলে দলে
পার হ'য়ে যায় ঘন ছায়ায় ঢাকা
মস্ত শহর, পাহাড়, নদী, বন,

বৃষ্টিধারায় হঠাৎ পড়ে গ'লে,
তেমনি আমার সঙ্গীহারা মন
চলেছে আজ হাওয়ার সঙ্গে ছুটে

ছোট্ট তোমার হাত দু-খানির দিকে,
যে-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে গলা
বলেছিলে, 'আমায় চিঠি লিখে

পাঠিয়ে দিয়ো ডাকওয়ালার হাতে।'
হয়নি মিছে ঐ কথাটি বলা,
একলা ব'সে লিখছি তোমায় চিঠি

কাজের শেষে কাজল-কালো রাতে।
যদিও তুমি পড়তে শেখোনিকো
বুঝবে নাকি আমার মনের কথা ?

তাড়াতাড়ি জবাব কিন্তু লিখো
কাগজ ভ'রে খানিক আঁকিবুঁকি
অর্থছাড়া বানান-হারা ভাষা,

কালিতে আর ভালোবাসায় মাখা।
থাকতো যদি ছোট্ট দুটি পাখা
চিঠি পেয়েই উড়ে যেতাম চ'লে।

আজ আকাশে যেমন এরোপ্লেন
শহর নদী পাহাড় হ'য়ে পার
পলকে ধায় দেশে দেশান্তরে,

হঠাৎ নামে বোমার বরিষনে,
তেমনি আমি হাওয়ার পিঠে চ'ড়ে
টুকরো ক'রে দিতেম অন্ধকার।

চুপটি ক'রে ঠিক নামতেম গিয়ে
যেখানে তুই ঘরের একটি কোণে
ঘুমিয়ে আছিস আবছা ভোরের আলোয়।

আমি কিন্তু ফেলতেম না বোমা
চুমো হ'য়ে ঝরতেম তোর মুখে,
চমকে চেয়ে বলতিস তুই, 'ও মা!

ভাখো চেয়ে, এসেছেন যে বাবা।'
মা বলতেন, 'কী যে বলিস, হাবা,
বাবা এখন কোত্থেকে আসবেন!'

হায়রে ভাগ্য! হায়রে এরোপ্লেন!
বোমা ফেলতে কতই দূরে যায়!
আমায় নিয়ে যায় না তো কেউ ওরা।

কলের পাখা বানিয়েছে তো বেশ
ও কি কেবল মানুষ-মারা দানো?
আমার তবু হয় না কেন ওড়া?

মনে জানি মিথ্যে এ-সব ভাবা।
ভাগ্যে তবু এ-মিথ্যেটা আছে
অতি কষ্টে তাই তো জীবন বাঁচে।
ইতি তোমার হাত-পা-বাঁধা বাবা।

বারো মাসের ছড়া

সবচেয়ে ভালোবাসি বৈশাখ মাস
মূর্ত আশার মতো দীপ্ত আকাশ।
জ্যৈষ্ঠের খর তাপ তীব্রপরশ
রোদ্দুরে যত রোষ আমে তত রস।
দীর্ঘ দ্বিপ্রহর অবসরে ভরা
সূর্য অস্ত যেতে করে না তো ত্বরা।
আষাঢ় আঁধার হ'য়ে আকাশে ছড়ায়
পাখা-পাওয়া পাহাড়ের চূড়ায়-চূড়ায়।
দলে-দলে চলে মেঘ, জ্বলে বিদ্যুৎ,
হঠাৎ বজ্র বাজে, বৃষ্টির দূত।
তারপর শ্রাবণের রিমঝিম রাত
জুঁইফুলে গন্ধের স্বপ্ন-প্রপাত।
চুপ ক'রে শুয়ে-শুয়ে কী-যে ভালো লাগা,
জেগে-জেগে ঘুম আর ঘুমে যেন জাগা।
ঝরোঝরো ঝরে জল অতল অথই,
মনে হয় আমি যেন রুমি আর নই।
নই আর ছোটো মেয়ে দাঁত নড়ো-নড়ো,
কাউকে না-ব'লে আমি হ'য়ে গেছি বড়ো।
টুটুকে, দিদিকে, মাকে গিয়েছি ছাড়িয়ে
নাগাল পান না বাবা দু-হাত বাড়িয়ে।
আমি যেন গল্পের, আমি যেন কোন
স্বপ্নের কাঞ্চনকুমারীর বোন।
ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি সেই আছি ছোটো,
মা বলেন, 'বেলা হ'লো, রুমুমণি ওঠো।'
ভাদ্রের মুখে হাসি, চোখে তবু জল
ঝরায় বাদল তার শেষ সম্বল।
আকাশে একটু লাগে নীলের পালিশ
ঝিকমিক রোদ ঠিক টাটকা ইলিশ।

রৌদ্রের রুপো হ'লো সোনা একদিন
পুজোর গন্ধ নিয়ে এলো আশ্বিন।
পাল-তোলা শাদা মেঘ আহ্লাদে খেলে,
সূর্যের একপাল উজ্জ্বল ছেলে।
কার্তিক ক্লান্তির কুয়াশায় মিশে
অঘ্রানে ডেকে আনে ধান্যের শিষে।
ছোটো হ'য়ে আসে দিন, বেলা পড়ে ঢ'লে
পৌষের সুন্দর রৌদ্রের কোলে।
পাঁচটা না-বাজতেই সূর্য পলায়
লম্বা ঘুমের রাত লেপের তলায়।
কালোকেলো কই মাছ লাল তেলে ভাসে
সবুজ মটরশুঁটি সাজে পাশে-পাশে।
আজ ভাবি, কাল ভাবি শীত বুঝি যায়
উত্তুরে হাওয়া তার উত্তর চায়।
মর্মরে ঝংকারে মাঘ এলো ঐ,
গাছে-গাছে ডালে-ডালে লাগে হৈ-চৈ।
আজ কেন সব-কিছু লাগছে নতুন ?
গুনগুন গুঞ্জনে এলো ফাল্গুন।
উঁকি দেয় উৎসুক আম্রমুকুল
তারি ফাঁকে কোকিলের বসে ইশকুল।
বাক্সে লুকায় যত কম্বল শাল,
হঠাৎ হাওয়ায় লাগে চৈত্রের তাল।
দিলখোলা দক্ষিণ, হালকা শরীর,
কত যেন ফুর্তির দিন-রাত্তির।
উত্তাপে উৎসাহ উচ্ছলে প্রাণে,
কাঁচা আম গ্রীষ্মের আশ্বাস আনে।
ঐরাবতের মতো বৈকালী মেঘে
উত্তাল ওঠে কালবৈশাখী রেগে।
ঝঞ্ঝায় উড়ে যায় পুরোনোর দায়
চৈত্রের সন্ধ্যায় বর্ষবিদায়।

চম্পাবরন কন্যা

রংমশালের সম্পাদকের চম্পাবরন কন্যা
ঘর করেছেন আলো ;
সমস্ত তাঁর ভালো।
দোষের মধ্যে একটি শুধু রাত্তিরে ঘুমোন না।
রাত্তিরে ঘুমোন না ,
পূর্ণ চাঁদের তাড়ার মতো,
প্রথম-ফোটা তারার মতো,
সন্ধ্যা হ'লেই তন্দ্রা-হারা চম্পাবরন কন্যা।
চম্পাবরন কন্যা ,
চোখ দুটি তাঁর কালো,
ঘর করেছেন আলো
দোষের মধ্যে সমস্ত রাত একটুও ঘুমোন না।
একটুও ঘুমোন না ,
কাঁদেন এবং কাঁদান তিনি,
হাত-পা ধ'রে সাধান তিনি,
রাতজাগাদের রাজকুমারী হবেন তিনি কোন না।
হবেন তিনি কোন না
ঘুম-পাড়ানি বঙ্গে
ঘুম-তাড়ানি সংঘে
বক্তৃতাতে তর্কাঘাতে আপন নামে ধন্যা।
নাম না-হ'তেই ধন্যা,
যত ইচ্ছে শতছিদ্র
কোরো তুমি মূঢ়নিদ্র
ভবিষ্যতের বঙ্গভূমে—লক্ষ্মী তো, এখন না।
লক্ষ্মী তো, এখন না ,
সম্পাদকের ঘুম খসালে _
কেমন ক'রে রংমশালে
পদ্ম বেঁধে তোমার পায়ে বলো তো দিই ধন্না।

রুমির পত্র—বাবাকে

ও বাবা, ও বাবা
দিদি বললে আমায়, 'হাবা!
তুই এটাও বুঝিস না!
নিজে পত্র বানিয়ে
বাবা ভোলান তা নিয়ে
নেই সত্যি পরি-মা।
বলে বিজ্ঞানে কী, জানিস,
আছে অনেক রকম জিনিশ,
অনেক অদ্ভুত জন্তু,
জন্মদিনের পরি,
কিংবা জ্বর তাড়ানো পরি
নেই সত্যিই কিন্তু।
ও-সব কুসংস্কারেই
দেশের দশা হ'লো এই,
এখন জওহরলালজী
যদি চল্লিশ কোটির
দেন ফরমাশ রোটির
তবে লঙ্কা, আটা, ঘি
নিয়ে লাগবে যারা কাজে
বল তাদের কাছে বাজে
তোর পরির মতো কী।'
আমি ভাবছি ব'সে তাই,
যদি তিমি দেখতে চাই
পাবো ছবি দেখতে বইয়ের,
তাতে বোঝাই যাবে না
তার কত্ত বড়ো হাঁ
যেন জাহাজ খাওয়া ঢেউয়ের।

আর   যখন ঘুমের আগে
আমার কেমন ভালো লাগে—
            শোনো   সত্যি কথাটা—
আমি   ঠিক দেখতে পাই
তুমি   যা লিখেছো তা-ই
            সেই চিঠির পরি-মা।
নিজ   চক্ষের দেখায়
বুঝি   মিথ্যেই শেখায়,
            আর   সত্যি হ'লো তা-ই,
যা   কক্‌খনো দেখিনি,
          জল-পাহাড়ি তিমির
            মাইল-জোড়া হাই!
দিদির বিজ্ঞানের বই
ভুল   করেছে নিশ্চয়ই—
            সত্যি না, বাবা?
যদি   পরি না-ই থাকে
তবে   বলো তো কোন ফাঁকে
            মনে   জাগলো পরির ভাবা?
বাবা   তুমি নিজেই ঐ
না-হয় পদ্য লিখেছোই
            কিন্তু পরি-মা
          সত্যি যদি না হন
তবে   তুমি-ই বা কেমন
            ক'রে   জানলে কথাটা!
আমার মনে হচ্ছে, শোনো,
পরি-   মায়ের কোনো-কোনো
            কথা   মোটেও শুনিনি,
তাই   না-ব'লে-ক'য়ে
          সত্যি মিথ্যে হ'য়ে
            মিলিয়ে গেলেন উনি?

দিদিকে লাল ফিতে
মা-কে যেই দেখেছি দিতে
কেঁদে বাধিয়েছি সেই হাট,
হয়নি আমার করা
কিছু তেমন লেখাপড়া
আজ বয়স হ'লো সাত।
খাবার সময় মিছিমিছি
আমার আছেই চ্যাচামেচি,
সেটা বড়োই বিশ্রী,
আর আঁচল ধ'রে মা-র
ঘ্যানঘেনে আবদার
না- ক'রেই পারিনি।
আমার এ-সব দোষে
দূর আকাশ-পারে ব'সে
পরি-মা রাগ ক'রে
আমায় দিলেন ফাঁকি?
বাবা, সত্যিই তা-ই নাকি?
রাখো, রাগো ধ'রে।
আমি মন করলেম আজই
মুখে আনবো না আর পাজি,
কক্- খনো না, কক্‌খনো,
আর নাকি সুরের কাঁদা,
কিংবা বেড়াল-গলা সাধা
আমার আবার যদি শোনো
তবে বেসো না আর ভালো,
তবে যা ইচ্ছে তাই বোলো—
কিছু বলতেও হবে না,
অঙ্ক আর ইংরিজি
আমি শিখবো নিজে-নিজেই—
বলো, সত্যি, পরি-মা!

আমি সত্যি হবো ভালো,
বাবা, সত্যি ক'রে বলো,
দিদি কিচ্ছু জানে না,
আমার চোখেই আঁকা সে
ঐ দূরের আকাশের
আমার সত্যি পরি-মা।

পরি-মার পত্র—বাবাকে

শুনুন, মশাই শুনুন,
আপনি যতই কথা বুনুন,
ছড়া যতই বাঁধুন না,
কেউ মানবে না আর, আছে
কোথাও দূরে কিংবা কাছে,
কোনো সত্যি পরি-মা।
যখন ছোট্ট ছিলো রুমি,
ছিলো কুট্টুস, টুনটুনি,
ঠিক দেখতে পেতো আমায়,
ঐ দূরের আকাশে
যেমন মেঘেরা ভাসে
চাঁদের আলোর জামায়।
তখন জন্মদিনের ভোরে,
কিংবা জ্বরের ঘোরে
রুমি বলতো, 'ও বাবা।
আমার মনে হচ্ছে আজই
হবেন পরি-মা ঠিক রাজি
আমায় চিঠি লিখতে আবার!'
ঐ কথা যেই শোনা,
আমার অমনি আনাগোনা
রুমির পাশে-পাশে,

যেমন হাওয়ার হাত
নাড়ে আহ্লাদে হঠাৎ
গাছে, পাতায়, ঘাসে।
সেই আহ্লাদি রুমির
অফু- রন্ত ঝুমঝুমির
আর ছন্দ শুনি না ;
আর ছোটো তো নেই—ষাট—
আজ বয়স হ'লো আট
রুমি ন'য়ে দিলো পা।
সেই কুট্টুস, টুনটুনি
আজ ইশকুল-পনঠুনি,
আর দু-দিন পরেই ক'যে
বুঝি-বা তার দিদির
মতো সে-ও হবে গম্ভীর
কেবল পড়া করবে ব'সে।
আজ যতই ভোলে বানান,
আপনি ততই ওকে শানান
ব-ফলা ম-ফলায়,
আর যক্ষুনি নামতায়
ও একটুও আমতায়
তক্ষুনি জোর গলায়
হেঁকে বলেন, রুমি !
তোমার এখনও দুষ্টুমি !
করো শীগ্গির মুখস্থ !'
দেখে বনেছি তাজ্জব,
তবে এও হ'লো সম্ভব—
আজ রুমিও ব্যস্ত !
এখন সময় বড়ো কড়া ;
আছে ইংরিজির পড়া,
আছে রিবন, জুতো, জামা,

সভ্যতা, ভব্যতা,
আছে ভদ্ররকম কথা ;
সময় নেই তো শুধু আমার।
তবে চক্ষু আরো বাঁকান,
আর বিদ্যে আরো শেখান,
কেন মিথ্যে ছড়া লেখা ?
আমি যাচ্ছি ফিরে সেই
আমার দূরের বাসাতেই,
সারা আকাশ ভ'রে একা।
ঐ তো রুমি ঘুমোয় ;
আমি শুধু একটি চুমোয়
তাকে ইচ্ছা দিয়ে যাই,
কাল জন্মদিনের ভোরে
যেন স্বপ্ন মনে প'ড়ে
উঠে আবছা বিছানায়
ভাবে, 'কে ছিলো এক্ষুনি ?
আমার নাম কে ডাকে শুনি ?
কই, আর তো শুনি না !
সত্যি কি তাহ'লে
গেলো আকাশ ভ'রে চ'লে
ঐ আমার পরি-মা ?'

গ্রন্থপরিচয়

সাহিত্যজীবনের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসু অজস্র কবিতা লিখেছেন। প্রায় পঁচিশ বছরের কাব্যচর্চার একটা ধারাবাহিক পরিচয় যাতে পাঠকের চোখে সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই সংকলন-গ্রন্থের কবিতাগুলি সাজানো হয়েছে। এ-পর্যন্ত প্রকাশিত কবির প্রায় প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থ থেকেই বিশিষ্ট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কবিতাসমূহ বর্তমান সংকলনে সংগৃহীত হ'ল। এ-ছাড়া, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে, অথচ এ-পর্যন্ত কবির কোনো কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয়নি এমন কয়েকটি রসোজ্জ্বল রচনা, বিচিত্র স্বাদের কয়েকটি প্রসিদ্ধ বিদেশী কবিতার অনুবাদ ও কিছু ছোটোদের কবিতাও সংযোজিত হ'ল গ্রন্থখানির সম্পূর্ণতাসাধনের প্রয়োজনে।

এই প্রসঙ্গে আরো জানানো দরকার যে, কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী পর-পর সাজানো হয়েছে। প্রত্যেকটি গ্রন্থের নির্বাচিত কবিতাসমূহের সন্নিবেশসাধনে এবং ছোটোদের কবিতার সংযোজনায় মোটামুটিভাবে কালক্রম অনুসরণ করা হয়েছে। শুধু অনুবাদ-অংশে এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছে, তাতে একই কবির একাধিক রচনার বিন্যাসসাধনে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি।

বর্তমান সংকলনে যে-সব গ্রন্থের কবিতা গৃহীত হয়েছে সেগুলির রচনা ও প্রকাশের তারিখ কিছু আনুষঙ্গিক তথ্যসহ সংক্ষিপ্তভাবে নিচে উদ্ধৃত হ'ল। বন্ধনীর মধ্যে প্রত্যেক কবিতার রচনাকাল এবং সেই সব সাময়িক পত্রের উল্লেখ করা হ'ল, যাতে গ্রন্থের অন্তর্গত বিভিন্ন কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়।

১. বন্দীর বন্দনা ও অন্যান্য কবিতা॥ রচনাকাল ১৯২৬-২৯। ['প্রগতি', 'কল্লোল', 'মহাকাল'] প্রথম প্রকাশ অক্টোবর, ১৯৩০। দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর, ১৯৪০। তৃতীয় সংস্করণ অগস্ট, ১৯৪৭। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তিতে কবি নতুন সংযোজনার উল্লেখ ক'রে লিখেছেন: "বন্দীর বন্দনার দ্বিতীয় সংস্করণে 'ক্ষণিকা' ও 'মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান' নামে দুটি কবিতা ও গুনতিতে ষোলোটি সনেট নতুন যোগ করা হ'লো। বইয়ের পাতায়, কোনো-কোনোটি ছাপার অক্ষরে, নতুন দেখা দিলেও রচনার তারিখ হিসেবে এরা পুরোনো, ১৯২৬ থেকে '২৯এর মধ্যে লেখা, অর্থাৎ প্রথম সংস্করণের কবিতাগুলির

সমসাময়িক। ব্যতিক্রম শুধু 'বিবাহ', যেটি লেখা হয় ১৯৩৩-এ ও আমার 'যেদিন ফুটলো কমল' নামক উপন্যাসে প্রথম ছাপা হয়।"...

এ-বই থেকে সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা পাঁচ :

শাপভ্রষ্ট (১৯২৬), বন্দীর বন্দনা (১৯২৮), প্রেমিক (১৯২৯), বিবাহ (১৯৩৩), মোরা তার গান রচি (১৯২৯)।

২. পৃথিবীর পথে ॥ রচনাকাল ১৯২৬-২৮। ['প্রগতি', 'কল্লোল'] প্রথম প্রকাশ ১৯৩৩। এ-বই থেকে সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা তিন :

অপূর্বদম্পতী (১৯২৮?), সুদূরিকা (১৯২৮?), আর-কিছু নাহি সাধ (১৯২৮?)।

৩. কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা ॥ রচনাকাল ১৯২৮-৩৫। ['প্রগতি', 'দীপিকা', 'বাসন্তিকা', 'উত্তরা', 'স্বদেশ', 'পরিচয়'] কয়েকটি কবিতা 'একটি কথা' নামক পুস্তিকার আকারে ১৯৩২-এ প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৭। দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত) ডিসেম্বর, ১৯৪৩। প্রথম সংস্করণের 'অন্ধকার সিঁড়ি' কবিতাটি বর্জিত হ'য়ে দ্বিতীয় সংস্করণে নতুন চোদ্দটি কবিতা সংযোজিত হয় এবং বর্তমান সংকলনের 'বিরহ' কবিতাটি তার অন্যতম। এ-বই থেকে সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা সাত :

কোনো মেয়ের প্রতি (১৯২৯), একখানা হাত (১৯৩০), কঙ্কাবতী (১৯২৯), গান (১৯৩০), আমন্ত্রণ—রমাকে (১৯৩০), মধ্যরাত্রে (১৯৩০), বিরহ (১৯৩৫)।

৪. নতুন পাতা ॥ রচনাকাল ১৯৩৩-৩৯। ['কবিতা'] প্রথম প্রকাশ ১৯৪০। গদ্য-কবিতাসংগ্রহ। প্রেমের কবিতা, প্রকৃতির কবিতা, বিদ্রূপের কবিতা, এই তিন ভাগে বিভক্ত। এ-বই থেকে সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা বারো :

এই শীতে (১৯৩৩), তুমি যখন চুল খুলে দাও (১৯৩৪), স্পর্শের প্রজ্বলন (১৯৩৪), বিনাযুদ্ধে জয়ী (১৯৩৪), নতুন দিন (১৯৩৪), দেবতা দুই (১৯৩৪), জন্ম (১৯৩৪), এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে (১৯৩৪), দয়াময়ী মহিলা (১৯৩৫), চিল্কায় সকাল (১৯৩৫), পাণ্ডুলিপি (১৯৩৪), বৃষ্টি আর ঝড় (১৯৩৯)।

৫. দময়ন্তী ॥ রচনাকাল ১৯৩৫-৪২। ['কবিতা', 'চতুরঙ্গ'] প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৪৩। গ্রন্থখানি 'দময়ন্তী' ও 'বিচিত্রিত মুহূর্ত' এই দুই ভাগে বিভক্ত। প্রসঙ্গত, গ্রন্থশেষে কলাকৌশলের আলোচনার শুরুতে কবি বলেছেন : "দময়ন্তী গ্রন্থন করবার পূর্বে কোনো-কোনো কবিতার

নানারকম পরিমার্জনা করেছি। কবিতার নামও অনেক ক্ষেত্রে বদলানো হয়েছে। এখানে (দময়ন্তী কাব্যগ্রন্থে) যে-আকারে কবিতাগুলি দেখা দিচ্ছে সেইটেই প্রামাণ্য পাঠ।... 'বন্দীর বন্দনা', 'কঙ্কাবতী'র কবিতা হু-হু ক'রে লিখেছিলুম, কিন্তু 'দময়ন্তী'র এক-একটি কবিতা লিখতে বিস্তর সময় লেগেছে, প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। আশা করি সে-পরিশ্রমের চিহ্ন কবিতাগুলির মুখশ্রীকে মলিন করতে পারেনি। গদ্যের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাব্যের আবেগ-সঞ্চারী স্বভাবের মিলন ঘটাতে চেয়েছি। দেখা গেছে এ দু'য়ের সম্বন্ধ তেল-জলের সম্বন্ধ নয়।"... এ-বই থেকে সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা সাত :

দময়ন্তী (১৯৩৯), ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা (১৯৩৭), নির্মম যৌবন (১৯২৮), ম্যাল-এ (১৯৩৮), সাগর-দোলা (১৯৩৮), ইলিশ (১৯৩৮), জোনাকি (১৯৩৮-৩৯)।

৬. এক পয়সায় একটি ॥ রচনাকাল ১৯৩৭-৪১। প্রথম প্রকাশ ১৯৪১। কবিতাভবন প্রকাশিত 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার প্রথম সংখ্যা। এ-বই থেকে সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা এক :

যামিনী রায়-কে (১৯৪১)।

৭. ২২শে শ্রাবণ ॥ রচনাকাল ১৯৪১-৪২। প্রথম প্রকাশ ১৯৪২। কবিতা-ভবন প্রকাশিত 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার পঞ্চম সংখ্যা। এ-বই থেকে সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা এক :

রবীন্দ্রনাথের প্রতি (১৯৪২)।

৮. দ্রৌপদীর শাড়ি ॥ রচনাকাল ১৯৪৪-৪৭। ['কবিতা', 'চতুরঙ্গ', 'বৈশাখী', 'রংমশাল'] ১৯৪৪-এ পরিমিত সংস্করণে মুদ্রিত 'রূপান্তর' গ্রন্থে কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ মার্চ, ১৯৪৮। এ-বই থেকে সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা আট :

মায়াবী টেবিল (১৯৪৪, পুনর্লিখিত ১৯৪৭), দ্রৌপদীর শাড়ি (১৯৪৫, পুনর্লিখিত ১৯৪৭), রূপান্তর (১৯৪৪), কোনো মৃতার প্রতি (১৯৪৪), বিকেল (১৯৪৪), পৌষ-পূর্ণিমা (১৯৪৬), প্রত্যহের ভার (১৯৪৬), অন্ধ প্রভু (১৯৪৬)।

*চিহ্নিত কবিতাগুলি, অনুবাদ ও ছোটোদের কবিতা ইতিপূর্বে কবির কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই কবিতাগুলির ক্ষেত্রে এখানে শুধু রচনাকাল ও সাময়িক পত্রের উল্লেখ করা হ'ল :

মধ্যতিরিশ ('কবিতা' ১৯৪৪), খণ্ড বৃষ্টি ('অর্চনা' ১৯৪৪), বর্ষার দিন ('কবিতা' ১৯৪৪), অসম্ভবের গান ('কবিতা' ১৯৫০)।

অনুবাদ ॥ ['পূর্বাশা', 'শতাব্দী', 'কবিতা'] বহু বিচিত্র বিদেশী কবিতার অনুবাদক হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বহু সাময়িক-পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাঁর অজস্র অনুবাদ-কবিতা ছড়িয়ে আছে। বর্তমান সংকলনে সংগৃহীত রচনার সংখ্যা সতেরো :

সাপ (১৯৩৪), ভিনাসের জন্ম (১৯৪৬), হেমন্ত (১৯৪৬), চুল (১৯৩৩ ?), সন্ধ্যা (১৯৪৯), ঊষা (১৯৪৯), স্তোত্র (১৯৪৯), শব (১৯৫২), আলবাট্রস (১৯৫২), বিষাদ-গাথা (১৯৫০), অমরতার গান (১৯৫০), যখন র'বো না আর মর্ত্য ছাঁচে (১৯৫০), হে সুন্দরী স্বতঃস্ফুট পৃথিবী কত বার (১৯৫০), নির্জন প্রাসাদ (১৯৫০), পাহাড়ি পথ (১৯৫০), মৃতা পত্নীকে (১৯৫০), আমার পিতৃব্য রাজগ্রন্থাগারিক ইউন-এর বিদায়-ভোজে (১৯৫০)।

ছোটোদের কবিতা ॥ ['মৌচাক', 'পাঠশালা', 'রংমশাল'] এ-পর্যন্ত পুস্তকাকারে বুদ্ধদেব বসুর ছোটোদের কবিতার কোনো সংকলন বা সংগ্রহ প্রকাশিত হয়নি। 'বারো মাসের ছড়া' নাম দিয়ে ছোটোদের জন্য একখানি কবিতাগ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমান সংকলনে সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা আট :

রামধনু (১৯২৯), ঘুমের সময় (১৯৩০), পরিমল-কে (১৯৩০), বাবার চিঠি (১৯৪২), বারো মাসের ছড়া (১৯৪৫), চম্পাবরন কন্যা (১৯৪৬), রুমির পত্র—বাবাকে (১৯৪৭), পরি-মার পত্র—বাবাকে (১৯৪৮)।